জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

শিক্ষক নির্দেশিকা

শারীরিক শিক্ষা

পঞ্চম শ্রেণি

লেখক ও সম্পাদক

আব্দুল হক
জসিম উদ্দিন আহম্মদ
তাজমুল হক

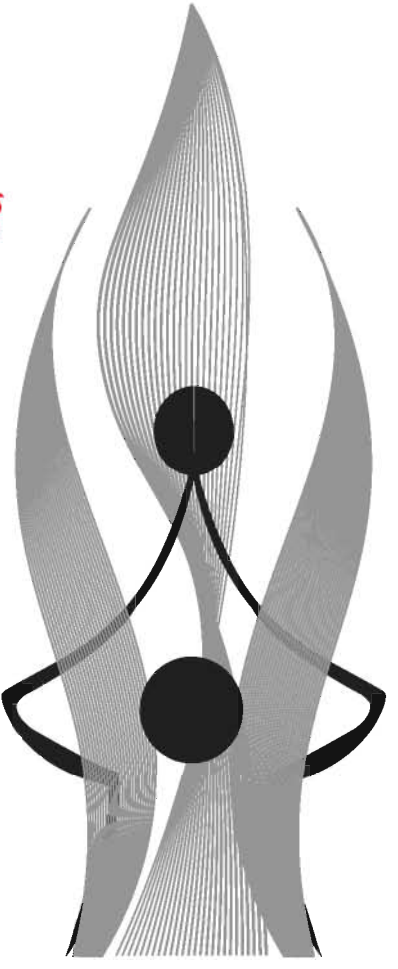

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৬

চিত্রাঙ্কন

কামাল উদ্দিন

সমন্বয়কারী

মোঃ মোস্তফা সাইফুল আলম

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণেঃ হুনান তিয়ানওয়েন জিনহুয়া প্রিন্টিং কো. লি. হুনান প্রভিন্স, চায়না

প্রসঙ্গ-কথা

প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯২ সালে প্রবর্তন করা হয় । শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রথম বারের মতো পরিমার্জন করা হয়। 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণীত হওয়ার পর ২০১১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পুনরায় পরিমার্জন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশের বিষয়টিকে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পরিমার্জিত নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০১৩ সালে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সারা দেশে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একই সঙ্গে যেসব বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে সেগুলোর জন্য শিক্ষক সংস্করণ, যেসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই সেগুলোর জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও বিজ্ঞান (সমন্বিত) বিষয়ের জন্য শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়।

প্রাথমিক স্তরে **শারীরিক শিক্ষা** একটি আবশ্যকীয় বিষয়। ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই। কাজেই প্রত্যেক শ্রেণির জন্য আলাদা আলাদা শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ও সুস্থ দেহ-মন গঠনের জন্য ব্যায়াম, খেলাধুলা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, চিত্ত বিনোদন ও সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির অর্জন উপযোগী যোগ্যতা চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রত্যেক শ্রেণিতে শারীরিক শিক্ষা নির্দেশিকায় ১০ টি অধ্যায় রয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়কে আবার কয়েকটি পাঠে বিভাজন করা হয়েছে এবং প্রতিটি পাঠের বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের নির্দেশনা, নিরাময়মূলক ব্যবস্থা, পরিকল্পিত কাজ, মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্ন ইত্যাদি শিক্ষক নির্দেশিকায় উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজস্ব শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপনের কৌশল রয়েছে। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে শিক্ষক নির্দেশিকায় বর্ণিত নির্দেশনার সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন– এমনটাই প্রত্যাশা করছি।

উল্লেখ্য, শিক্ষক নির্দেশিকাটি প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও চূড়ান্তকরণের কাজে বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণি শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও বিষয় বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেছেন। শিক্ষক নির্দেশিকাসমূহ শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযোগী হয়েছে কি না তা যাচাই করার জন্য ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে দেশের সাতটি বিভাগের মোট ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ট্রাই আউট সম্পন্ন করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষক নির্দেশিকাটি প্রণীত হয়েছে। এটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও পরিমার্জন থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। যাঁদের জন্য এটি প্রণীত ও প্রকাশিত হলো, অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণিকক্ষে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করলে দেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে এবং আমাদের এই উদ্যোগ ও প্রয়াস সফল হবে। এর ফলে দেশের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের এই মহৎ আয়োজন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা

শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ও সুস্থ্য দেহ-মন গঠনের জন্য শারীরিক শিক্ষা বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু বিষয়টির জন্য নির্দিষ্ট কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই, সেহেতু শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকাটি পাঠদান ও বিভিন্ন Activities পরিচালনায় ব্যাপক সহায়তা করবে। শিক্ষার্থীদের অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে শিখন শেখানো কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা জন্য শিক্ষককে কতগুলো বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। নিচে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হলো।

১। শিক্ষক প্রতিপাঠের প্রস্তুতি গ্রহণকালে সংশ্লিষ্ট পাঠটি ভালোভাবে পড়বেন ও পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত করবেন।

২। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শারীরিক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যই হচ্ছে খেলার ছলে ব্যায়াম। এটি অনুসরণ করে ক্লাস নিতে হবে।

৩। জোড়ায় জোড়ায় অনুশীলনের সময় ওজন ও উচ্চতার দিকে লক্ষ রাখতে হবে এবং সে মোতাবেক ব্যায়াম নির্বাচন করতে হবে।

৪। যেকোনো খেলাধুলা ও ব্যায়াম করার আগে স্ট্রেচিং ও হালকা ব্যায়াম করাতে হবে।

৫। প্রথমে ব্যায়াম ও খেলার কৌশল নিজে দেখাতে হবে পরে শিক্ষার্থীদেরকে অনুশীলন করাতে হবে।

৬। শিক্ষার্থীদের কখনও সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড় করাবেন না।

৭। খেলা ও খেলার কৌশল বর্ণনা করার সময় সকল শিক্ষার্থীদের চোখের আওতার মধ্যে রেখে বুঝাতে হবে।

৮। কৌশলগুলো পার্ট বাই পার্ট বা ভেঙ্গে ভেঙ্গে বুঝাতে হবে।

৯। কৌশলগুলো বুঝানোর পর ছোট ছোট গ্রুপ করে অনুশীলন করাতে হবে।

১০। সব শিক্ষার্থী যেন খেলাধুলায় অংশ নিতে পারে সে ব্যাপারে লক্ষ রাখতে হবে।

১১। খেলাধুলা বা ব্যায়াম অনুশীলনের সময় ব্যবহারিক পোশাক পরিধান করতে বলবেন।

১২। খেলাধুলার কৌশল বা ব্যায়াম অনুশীলনের ধারা ক্রমান্বয়ে সহজ থেকে কঠিনতর হবে।

১৩। খেলাধুলা করার সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে সেজন্য প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১৪। ক্রিকেট খেলা অনুশীলনের সময় রাবারের বল ব্যবহার করতে হবে।

১৫। ব্যাট, বলগুলো শিক্ষার্থীদের উপযোগী হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

১৬। খেলার মাঠ যেন অসমতল বা ইটের টুকরা না থাকে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

১৭। ক্লাস শেষে ভেজা গেঞ্জি খুলে ফেলার নির্দেশ দিতে হবে।

১৮। শিক্ষার্থীদের দেয়া পরিকল্পিত কাজ পরবর্তী ক্লাসে সংগ্রহ করে মূল্যায়ন করতে হবে।

১৯। শিখন শেখানো কার্যাবলি বাস্তবায়নের জন্য মাঝে মধ্যে অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করতে হবে।

যেহেতু শারীরিক শিক্ষায় খেলাধুলা , ব্যায়াম, নাচ, মার্চ-পাস্ট এবং বিভিন্ন Activity বেশি। সেহেতু শিক্ষক ইচ্ছে করলে শ্রেণিকক্ষের পাঠদানের সময় কমিয়ে বহিরাঙ্গণ কার্যক্রমে বেশি সময় দিতে পারেন। ইচ্ছে করলে তিনি প্রাসঙ্গিক কিছু কার্যক্রম শ্রেণিকক্ষে না করিয়ে মাঠে বা বহিরাঙ্গণে করতে পারেন।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	**১. ব্যক্তিগত ও পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন**	১–১৫
	১.১ ব্যক্তিগত ও পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতা ও সুস্থতা	২
	১.২ বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ পালন ও পরিবেশ উন্নয়ন	৫
	১.৩ নিরাপদ ও দূষিত পানি	৮
	১.৪ পানিবাহিত ও সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগ, ডেঙ্গুজ্বর	১০
দ্বিতীয় অধ্যায়	**২. খেলাধুলার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ**	১৬–৩৯
	২.১ মার্চপাস্ট ও সালাম প্রদান	১৭
	২.২ সামনে পেছনে ডিগবাজি, কার্ট হুইল ও হ্যান্ডস্ট্যান্ড	১৮
	২.৩ অভ্যন্তরীণ খেলা- ক্যারাম, দাবা	২০
	২.৪ বহিরাঙ্গন খেলা-ক্রিকেট, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, হ্যান্ডবল	২৩
তৃতীয় অধ্যায়	**৩. ছন্দময় ব্যায়াম ও নাচ**	৪০–৪৫
	৩.১ ছড়াগান ও তালে তালে নাচ	৪০
	৩.২ নাচের তালে তালে পিটি ও ব্যায়াম	৪৩
চতুর্থ অধ্যায়	**৪. শৃঙ্খলা ও নেতৃত্ব**	৪৬–৫০
	৪.১ বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালনার মাধ্যমে নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন	৪৬
	৪.২ খেলাধুলার সরঞ্জামাদির যত্ন ও সংরক্ষণ	৪৯
পঞ্চম অধ্যায়	**৫. পরিমিত খেলাধুলা ও বিশ্রাম**	৫১–৫৪
	৫.১ স্বাস্থ্য রক্ষার পরিমিত খেলাধুলা, বিশ্রাম ও ঘুম	৫১
	৫.২ সময়মতো ঘুমানো ও ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস	৫৩
ষষ্ঠ অধ্যায়	**৬. খাদ্য, খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ ও পুষ্টি উপাদান**	৫৫–৫৯
	৬.১ খাদ্যে ও খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ	৫৫
	৬.২ খাদ্যে পুষ্টির উপাদান	৫৭
সপ্তম অধ্যায়	**৭. দৈনন্দিন জীবনে দুর্ঘটনা**	৬০–৬৩
	৭.১ খেলাধুলায় সংঘটিত দুর্ঘটনা ও সতর্কতা অবলম্বন	৬০
	৭.২ বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ও সতর্কতা অবলম্বন	৬২
	৭.৩ বাড়িতে বা আশপাশে আগুন লাগলে করণীয়	৬৩
অষ্টম অধ্যায়	**৮. প্রাথমিক চিকিৎসা**	৬৪–৬৯
	৮.১ ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ড্রেসিং ও ব্যান্ডেজ	৬৪
	৮.২ বিভিন্ন দুর্ঘটনার প্রাথমিক চিকিৎসা	৬৭
নবম অধ্যায়	**৯. দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হওয়া**	৭০–৭৩
	৯.১ প্রাত্যহিক সমাবেশ পরিচালনা ও সমাবেশে অংশগ্রহণ	৭০
	৯.২ স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস	৭২
দশম অধ্যায়	**১০. বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা**	৭৪–৭৯
	১০.১ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন, পরিচালনা ও পুরস্কার বিতরণ	৭৪
	১০.২ দৌড় আরম্ভ ও প্রতিযোগিতার ইভেন্ট	৭৬

প্রথম অধ্যায়

ব্যক্তিগত ও পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

১.১ ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, নিজ বাড়ি ও বিদ্যালয়সহ পারিপার্শ্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব অনুধাবন ও পরিবেশ উন্নয়নে অংশগ্রহণ করবে।

১.২ নিরাপদ পানির ব্যবহার সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে পারবে।

১.৩ পানিবাহিত ও সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে পারবে।

১.৪ ডেঙ্গুজ্বর, জলবসন্ত সম্পর্কে জানতে পারবে।

শিখনফল :

১.১.১ ব্যক্তিগত ও পারিপার্শ্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব অনুধাবন করে অভ্যাসে পরিণত করতে পারবে।

১.১.২ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কীভাবে সুস্থতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে তা বলতে পারবে।

১.১.৩ নিজের বাসগৃহ, শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।

১.১.৪ বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ পালনে অংশগ্রহণ করবে।

১.২.১ নিরাপদ পানি ব্যবহারের সুফল বলতে পারবে।

১.২.২ দূষিত পানি ব্যবহারের কুফল বলতে পারবে।

১.৩.১ পানিবাহিত ও সংক্রামক রোগ যেমন– কলেরা, ডায়রিয়া, বসন্ত , হাম , চর্মরোগ, খোস-পাঁচড়া, সম্পর্কে বলতে পারবে।

১.৪.১ ডেঙ্গুজ্বরের উৎপত্তি ও রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে পারবে।

১.৪.২ সংক্রামক ও ছোঁয়াচে রোগ কী এবং এর প্রতিকার সম্পর্কে বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন–০৫

পাঠ–০১ : ব্যক্তিগত ও পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতা ও সুস্থতা, নিজ বাড়ি, শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতা।

শিখনফল :

১.১.১ ব্যক্তিগত ও পারিপার্শ্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব অনুধাবন করে অভ্যাসে পরিণত করতে পারবে।

১.১.২ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কীভাবে সুস্থতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে তা বলতে পারবে।

১.১.৩ নিজের বাসগৃহ, শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : ব্রাশ, পেস্ট, নিমের ডাল, তোয়ালে/গামছা, নেইল কাটার, চিরুনি।

বিষয়বস্তু : শারীরিক সুস্থতা: জীবনকে উপভোগ করতে হলে সবার আগে প্রয়োজন শারীরিক সুস্থতা। স্বাস্থ্য মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। ছোটকালের অভ্যাস পরবর্তী সময়ে কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। ছোটবেলা থেকে মানুষ যে অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, সে অভ্যাস পরিত্যাগ করা বড়ই কঠিন। কাজেই নীরোগ ও সুস্থ দেহে বেঁচে থাকতে হলে ছোটবেলা থেকেই সকলের সু অভ্যাসে অভ্যস্ত হওয়া উচিত।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য – ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য হচ্ছে ঐ সমস্ত ব্যক্তিগত বিধিবিধান, যা প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাস্থ্য ও সুস্থতাকে প্রভাবিত করে। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ভালো অবস্থায় রাখতে যা কিছু নিয়ম পালনের প্রয়োজন তা অবশ্যই প্রত্যেককে নিজে নিজেই করতে হবে। যেমন–

১. প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে মুখ ধোয়া ও পরিষ্কার করা।

২. সকালে ঘুম থেকে উঠে ও রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ভালোভাবে দাঁত ব্রাশ করা।

৩. চোখ পরিষ্কার রাখা ও চোখের যত্ন করা।

৪. কান পরিষ্কার রাখা।

৫. চুল কাটা ও চুলের যত্ন করা।

৬. নখ কাটা ও পরিষ্কার রাখা।

৭. ত্বকের যত্ন করা।

৮. নিয়মিত গোসল করা।

৯. পরিধেয় বস্ত্রাদি ধোয়া ও যত্ন করা।

১০. নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা।

১১. নিয়মিত মলমূত্র ত্যাগ ও শৌচাদি করা।

১২. দাঁত দিয়ে নখ বা অন্য কিছু কাটা।

১৩. বাইরের খোলা খাবার না খাওয়া ও খাবার ভালোভাবে চিবিয়ে খাওয়া।

১৪. অপরিষ্কার জায়গায় বসে খাবার না খাওয়া।

১৫. যেখানে সেখানে মলত্যাগ বা প্রস্রাব না করা এবং মলত্যাগের পর সাবান/ছাই দিয়ে হাত পরিষ্কার করা।

১৬. রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়া এবং ভোরে জেগে ওঠা।

১৭. যে কোনো পরিশ্রমের কাজ শেষে ঘামে ভেজা কাপড়-চোপড় বদলিয়ে শরীর শুকনো কাপড় দিয়ে মোছা।

১৮. প্রচুর পানি পান করা।

১৯. নলকূপের পানি বা ফোটানো পানি পান করা।

২০. পরিমিতভাবে পরিশ্রম ও বিশ্রাম করা।

পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতা : স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের জন্য শুধু ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য রক্ষাই যথেষ্ট নয়। এ জন্য পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতা অর্থাৎ স্বাস্থ্যকর পরিবেশের প্রয়োজন। আমাদের সুস্বাস্থ্যের ওপর পরিবেশের প্রভাব অনেক। পরিবেশ সুন্দর না হলে সেখানে স্বাস্থ্য ভালো থাকতে পারে না। ময়লা ও আবর্জনা সংক্রামক রোগের জীবাণু বাহক এবং একই সাথে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক।

নিজ বাড়ির পরিচ্ছন্নতা : বাড়ির পরিবেশ সুন্দর রাখতে হলে বাড়ির আশপাশে কোথাও ময়লা-আবর্জনা জমিয়ে রাখা যাবে না। চারপাশের রাস্তাঘাট, পুকুর, ডোবা, নালা সব সময় পরিষ্কার রাখতে হবে। ঘরে যাতে আলো-বাতাস সহজে প্রবেশ করতে পারে, এর জন্য পর্যাপ্ত জানালা-দরজা থাকতে হবে। ঘরের দরজা-জানালা ও আসবাবপত্র ঝেড়ে-মুছে সব সময় পরিষ্কার রাখতে হবে। ঘরের মেঝে প্রতিদিন ঝাড় দিতে হবে। দরজা-জানালা খোলা রাখার জন্য পর্দার ব্যবস্থা করতে হবে। কাঁচা ঘর হলে মাঝেমধ্যে মাটি দিয়ে লেপতে হবে এবং পাকা দালান হলে কয়েক বছর পর পর চুনকাম করতে হবে। বাড়ির চারপাশের গাছের ডালপালা বড় হলে ছেঁটে দিতে হবে, যাতে আলো-বাতাস বাড়িতে প্রবেশ করতে পারে। বাড়ির সামনে একটি ফুলের বাগান থাকলে বাড়ির সৌন্দর্য আরও বেড়ে যায়। তাতে মনও প্রফুল্ল থাকে।

শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতা : বিদ্যালয়ের পরিবেশের উপর শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য, আনন্দ ও কর্মক্ষমতা নির্ভর করে। তাই বিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

আলো-বাতাসপূর্ণ উন্মুক্ত স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। কলকারখানা , রেললাইন, ভারী যানবাহন চলাচলের রাস্তা , হাটবাজার থেকে বিদ্যালয় একটু দূরে হওয়া প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের আশপাশে কোনো কবরস্থান, শ্মশান এবং নর্দমা থাকা উচিত নয়। বিদ্যালয়ের আঙিনা এবং খেলার মাঠে কোনো গর্ত থাকবে না। বিশুদ্ধ পানির জন্য টিউবওয়েলের ব্যবস্থা রাখতে হবে। স্কুলের কাছে ফেরিওয়ালা বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকারক খাবার নিয়ে যাতে বসতে না পারে,তার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয় পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব নিতে হবে। শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয়ের দেয়ালে কোনো কিছু লেখা থেকে বিরত থাকতে হবে। ব্ল্যাকবোর্ড, আসবাবপত্র পরিষ্কার রাখতে হবে। নির্দিষ্ট স্থানে থুথু বা ময়লা ফেলতে হবে। বিদ্যালয় ও খেলার মাঠে ছেঁড়া কাগজ, বাদামের খোসা, ইটের টুকরা না ফেলার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। স্বাস্থ্যকর পায়খানা ও প্রস্রাবখানা থাকতে হবে এবং নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৃষ্টি বা বর্ষার পানি জমে থাকলে নানা ধরনের রোগ ছড়াতে ও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এ ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। বিদ্যালয়ের আশপাশে অসুবিধা সৃষ্টিকারী গাছ ও ডালপালা কেটে মশা, মাছি, পোকা-মাকড়ের উপদ্রব থেকে মুক্ত রাখতে হবে। পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ। এটা মনের উপরও প্রভাব বিস্তার করে। সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ মনকে পবিত্র ও সুন্দর করে তোলে। পরিচ্ছন্নতা দেহ ও মনের সৌন্দর্যের প্রতীক।

শিখন শেখানো কার্যাবলি : ব্যক্তিগত ও পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতা কী, তা শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করবেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কীভাবে সুস্থতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে তা ব্যাখ্যা করবেন। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, নিজ বাড়ি, শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ রক্ষার জন্য আমাদের কী কী করণীয় তা সুন্দরভাবে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন। উপরিউক্ত বিষয় শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছে কি, না তা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নিশ্চিত হবেন।

পরিকল্পিত কাজ : সুস্থতার জন্য ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার কার্যক্রমে প্রত্যেকেই অংশগ্রহণ করবে। নিজ বাড়ি, শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয় পরিচ্ছন্নতায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে। শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয়ের আঙিনা পরিষ্কার করবে।

মূল্যায়ন :

১. মুখ কখন পরিষ্কার করতে হয়?

২. কখন দাঁত ব্রাশ করতে হবে?

৩. নিয়মিত গোসল না করলে কী সমস্যা হয়?

৪. পুষ্টিকর খাবার কেন প্রয়োজন?

৫. কোথায় মলমূত্র ত্যাগ করা উচিত?

৬. মল ত্যাগের পর কী দিয়ে হাত ধুতে হবে?

৭. কী ধরনের পানি পান করতে হবে?

৮. ঘরে আলো-বাতাস প্রবেশের জন্য কী থাকতে হবে?

৯. বাড়ির চারপাশের গাছপালা বড় ও ঘন হয়ে গেলে কী করতে হয়?

১০. কেমন স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত?

১১. থুথু ও ময়লা কোথায় ফেলতে হবে?

১২. শ্রেণিকক্ষ কীভাবে পরিষ্কার রাখবে?

পাঠ–০২ : বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ পালন ও পরিবেশ উন্নয়ন।

শিখনফল :

১.১.৪ বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ পালনে অংশগ্রহণ করবে।

উপকরণ : গাছের চারা ও পানি।

বিষয়বস্তু : একটি দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য মোট ভূমির শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশে মোট ভূমির মাত্র ১৬ ভাগ বনভূমি রয়েছে। মানুষ ও প্রাণীর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বৃক্ষের ব্যাপক প্রয়োজন রয়েছে। মানবজীবনের সঙ্গে বৃক্ষের সম্পর্ক সুগভীর। বৃক্ষ আমাদের জীবনের নীরব বন্ধু। নিচে বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তার কয়েকটি দিক উল্লেখ করা হলো–

ক. বৃক্ষ প্রাণীজগৎ কে খাদ্য দেয়। মানুষ ও পশু–পাখি বৃক্ষের ফুল–ফল এবং পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে।

খ. বৃক্ষ জীবনদানকারী অক্সিজেন দেয়। বৃক্ষ প্রাণীকুলের ত্যাগ করা বিষাক্ত কার্বন ডাই–অক্সাইড গ্রহণ করে। ফলে প্রাণীরা এই জগতে বেঁচে থাকতে পারে।

গ. বৃক্ষ আমাদের জ্বালানি দেয়।

ঘ. বৃক্ষ আমাদের আসবাবপত্র এবং গৃহ নির্মাণের সামগ্রী দেয়।

ঙ. বৃক্ষ থেকে কাগজের মণ্ড ও দিয়াশলাই তৈরি হয়।

চ. গাছপালা দেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে। এতে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে।

ছ. বৃক্ষাদি ঝড় ঝঞ্ঝা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে বাসগৃহকে রক্ষা করে।

জ. বৃক্ষ আমাদের জীবন রক্ষার নানা ওষুধ দান করে।

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়েই আমাদের পরিবেশ। পরিবেশের একটি প্রাকৃতিক উপাদান হচ্ছে বৃক্ষ। এই বৃক্ষস্বল্পতা যেকোনো দেশের জন্য ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে। বাংলাদেশেও এর অশুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস আমাদের দেশে লেগেই আছে। কাজেই বনজ সম্পদকে টিকিয়ে রাখা ও এর সম্প্রসারণের জন্য আমাদের প্রতিবছর বৃক্ষরোপন অভিযান পরিচালনা করা হয়। সপ্তাহ, পক্ষকাল বা মাসব্যাপী এ অভিযান চলে। এ সময় পরিকল্পিত উপায়ে বৃক্ষরোপন করা হয়। সাধারণত প্রতিবছর বর্ষাকালে সরকারের বন বিভাগের উদ্যোগে এই অভিযান চালানো হয়। নিকটস্থ নার্সারি থেকে বিনা মূল্যে বা স্বল্প মূল্যে গাছের চারা সংগ্রহ করা যায়। আমরা প্রত্যেকে যদি কমপক্ষে একটা করে গাছ লাগাই তাহলে সহযেই আমাদের এ অভিযান সফল হবে। জীবনধারণের জন্য যে বৃক্ষ আমাদের অক্সিজেন দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে, প্রতিদানে আমরা তাকে নিধন করে চলেছি নির্মমভাবে। ফলে সবুজে-শ্যামলে ভরা বাংলাদেশে নেমে এসেছে পরিবেশ বিপর্যয়। এ বিপর্যয় থেকে বাঁচার জন্য আমাদের সবাইকে বাড়ির আশপাশে গাছপালা লাগাতে হবে। বৃক্ষরোপণ কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে হবে। শুধু গাছপালা লাগালেই হবে না, গাছের যত্ন নিতে হবে। লোকজনকে অপ্রয়োজনে গাছপালা কাটতে বারণ করতে হবে। তবেই আমরা আমাদের পরিবেশকে সংরক্ষণ করতে পারব।

বৃক্ষরোপণ

শিখন শেখানো কার্যাবলি : পরিবেশ উন্নয়নে বৃক্ষের ভূমিকা সম্পর্কে অর্থাৎ বৃক্ষ দ্বারা আমরা কী কী ভাবে উপকৃত হই এবং বৃক্ষশূন্যতায় পরিবেশের কী বিপর্যয় ঘটে, তা বিস্তারিতভাবে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন। শিক্ষার্থীরা কতটুকু জানতে পেরেছে তা বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জেনে নেবেন।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা তাদের বাড়ির আশপাশে বিভিন্ন প্রকারের বৃক্ষরোপণ করবে। রোপণের পর নিরাপত্তার জন্য বেড়া দেয়ার ব্যবস্থা এবং নিয়মিত যত্ন করবে। কে কী ধরনের গাছ রোপণ করল এবং বেড়ে ওঠার অবস্থা সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করবে। সরকার গৃহীত বৃক্ষরোপণ সপ্তাহেও অংশগ্রহণ করবে।

মূল্যায়ন :

১. একটি দেশে কী পরিমাণ বনভূমি থাকা প্রয়োজন?

২. কীভাবে বৃক্ষ আমাদের উপকার করে?

৩. পরিবেশ বলতে কী বোঝায়?

৪. বৃক্ষস্বল্পতায় কী ধরনের বিপর্যয় ঘটে?

৫. পরিবেশ উন্নয়নে আমাদের কী করা উচিত?

পাঠ–০৩ : নিরাপদ ও দূষিত পানি

শিখনফল :

১.২.১ নিরাপদ পানি ব্যবহারের সুফল বলতে পারবে।

১.২.২ দূষিত পানি ব্যবহারের কুফল বলতে পারবে।

উপকরণ : টিউবওয়েল, ফিল্টার এবং পুকুরের গরু গোসল করার পোস্টার-জাতীয় ছবি।

বিষয়বস্তু : নিরাপদ পানি– দৈনন্দিন জীবনে পানির ব্যবহার বহুবিধ। আমরা পানি পান করি, গোসল ও ধোয়ামোছার কাজে ব্যবহার করি। এই পানি বৃষ্টি, ঝরনা, নদী–নালা, খাল–বিল, ডোবা–পুকুর প্রভৃতি উৎস থেকে পাই। গ্রাম অঞ্চলের লোকেরা সাধারণত এ সকল উৎস থেকে পানি সংগ্রহ করে। শহরে পানির প্রধান উৎস ট্যাপ বা কল। শহর কর্তৃপক্ষ নদী বা ভূগর্ভ থেকে পানি সংগ্রহ করে। শোধণকৃত পানি পাইপের সাহায্যে সরবরাহ করে থাকে। পানির অপর নাম জীবন। কাজেই সব সময় নিরাপদ পানি পান করতে হবে। কেননা নিরাপদ পানির অভাবে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

পানি নিরাপদ করার উপায় :

ক. আর্সেনিকমুক্ত টিউবওয়েলের পানি সবচেয়ে নিরাপদ ও বিশুদ্ধ। টিউবওয়েলের পানিতে সাধারণত কোনো রোগজীবাণু থাকে না।

খ. খাল–বিল বা নদীর পানি ভালোভাবে ফুটিয়ে ঠান্ডা করে নিরাপদ পানযোগ্য করা যায়।

গ. হ্যালোজেন ট্যাবলেট ও ফিটকিরি দিয়ে পানি শোধন করে তা পানযোগ্য করা যায়।

ঘ. ফিল্টার বা সিদ্ধ করা পানি পান করা নিরাপদ।

দূষিত পানি : শহর কিংবা গ্রামে জনসংখ্যা যত বাড়তে থাকে, পানি ও খাদ্যের চাহিদাও তত বাড়তে থাকে। খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হলে জমিতে পানি সেচ ও রাসায়নিক সার দিতে হয়। খেতের পোকামাকড় দমনের জন্য বিভিন্ন রকম কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। এ ওষুধের কিছু অংশ বৃষ্টির পানি দূষিত করে। এর ফলে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী মরে যায়। পুকুরের পানিতে গরু, মহিষ, ছাগল গোসল করালেও পানি দূষিত হয়। জলাশয়, কূপ কিংবা নলকূপের আশপাশে মল ত্যাগ করলে পানি দূষিত হতে পারে। কূপের গা চুইয়ে বাইরের ময়লা পানি কূপের মধ্যে ঢুকে পানি দূষিত করতে পারে। খাদ্যের উচ্ছিষ্ট, ময়লা-আবর্জনা, জীবজন্তুর মৃতদেহ, গৃহস্থালির ব্যবহার্য নানা ধরনের পচনশীল জিনিস পচে বিভিন্ন প্রকার রোগজীবাণু সৃষ্টি করে। এ সমস্ত রোগজীবাণু বৃষ্টির পানি, বাতাস, অন্যান্য জীবজন্তুর মাধ্যমে বাহিত হয়। সবশেষে নদী–নালা, ডোবা–পুকুর, খাল–বিল এবং কলের পানিকেও দূষিত করে। এই দূষিত পানি পান করলে মানুষ কলেরা, উদরাময়, আমাশয়, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়। আমাদের দেশের বিভিন্ন শিল্প যেমন– কাপড়কল, পাটকল, কাগজকল, রাসায়নিক কারখানা, সার কারখানা, চামড়া প্রক্রিয়াজাত কারখানাগুলো সাধারণত নদীর ধারেই অবস্থিত। এ সকল কারখানার বর্জ্য পদার্থ নদী নালার পানি দূষিত করে। এই দূষিত পানি ব্যবহারে আমাদের চর্মরোগ হয়।

শিখন শেখানো কার্যাবলি : শিক্ষার্থীদের নিরাপদ বা বিশুদ্ধ পানি, পানি নিরাপদ করার পদ্ধতি এবং দূষিত পানি ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে বুঝিয়ে দেবেন। দূষিত পানি পান করলে কী ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়, সে সম্বন্ধে ধারণা দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীদের দুটি দলে ভাগ করে একটি দল নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে পানি নিরাপদ বা বিশুদ্ধ করার পদ্ধতিগুলো লিখবে। অপর দলটি দূষিত পানি ব্যবহারের কুফলগুলো লিখবে। তাদের লিখিত কাগজ বোর্ডে পাশাপাশি স্থাপন করবে এবং লিখিত পয়েন্টগুলো নিয়ে নিজেরা আলোচনা করে তাদের জ্ঞানকে আরও স্পষ্ট করবে।

মূল্যায়ন :

১. নিরাপদ বা বিশুদ্ধ পানি কাকে বলে?

২. পানি নিরাপদ করার উপায় বল?

৩. কীভাবে পানি দূষিত হয়?

৪. দূষিত পানি ব্যবহারে কী ধরনের অসুখ হয়?

৫. পানি দূষণমুক্ত রাখার জন্য কী করা উচিত?

পাঠ–০৪ : পানিবাহিত ও সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগ।

শিখনফল :

১.৩.১ পানিবাহিত ও সংক্রামক রোগ যেমন– কলেরা, ডায়রিয়া, বসন্ত, হাম, চর্মরোগ, খোস-পাঁচড়া, সম্পর্কে বলতে পারবে।

১.৪.২ সংক্রামক ও ছোঁয়াচে রোগ কী এবং এর প্রতিকার সম্পর্কে বলতে পারবে।

উপকরণ : কলেরা, ডায়রিয়া, বসন্ত, হামে আক্রান্ত রোগীর পোস্টার জাতীয় ছবি।

বিষয়বস্তু : পানিবাহিত রোগ : যেসব রোগজীবাণু পানির মাধ্যমে ছড়ায়, সেসব রোগকে পানিবাহিত রোগ বলে। যেমন– কলেরা, ডায়রিয়া ইত্যাদি।

কলেরা : ভিব্রিওকলেরি নামক এক প্রকার জীবাণু দ্বারা কলেরা সংক্রামিত হয়। পানিবাহিত রোগের মধ্যে কলেরা অত্যন্ত মারাত্মক।

লক্ষণ : জীবাণু উদরে প্রবেশের কয়েক ঘন্টার মধ্যে রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। চাল ধোয়া পানির মতো পায়খানা ও বমি হতে থাকে। হাতে-পায়ে খিল ধরে ও খিঁচুনি দেখা দেয়। শরীর পানিশূন্য হয়ে পড়ে। প্রস্রাব কমে যায়। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ডায়রিয়া : ডায়রিয়া বাংলাদেশের একটি অন্যতম পানিবাহিত রোগ। এ রোগের আক্রমণে প্রতিবছর অনেক মানুষ মারা যায়। বিশেষ করে এ রোগে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুর হার খুব বেশি। ডায়রিয়া হলে রোগীর দেহ থেকে পানি ও লবণ বেরিয়ে যায়। ফলে দেহের পানি কমে যায়। রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে। ঠিকমতো চিকিৎসা করা না হলে রোগী মারাও যেতে পারে।

লক্ষণ : ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হয়; বারবার বমি হয়; খুব পিপাসা লাগে; মুখ ও জিহ্বা শুকিয়ে যায়; চোখ বসে যায়; কাঁদলে শিশুর মাথার চাঁদি বা তালু বসে যায়; আস্তে আস্তে রোগী নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

প্রতিকার : ডায়রিয়া রোগের লক্ষণ দেখা দিলে সাথে সাথেই রোগীকে খাবার স্যালাইন খাওয়ানো শুরু করতে হবে। স্যালাইন খাওয়ানোর পাশাপাশি রোগীকে তার উপযোগী স্বাভাবিক খাবার দিতে হবে। স্যালাইন

খাওয়ানোর পরও পায়খানা না কমলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। আজকাল বাজারে খাওয়ার স্যালাইন কিনতে পাওয়া যায়। প্যাকেটের গায়ে এই স্যালাইন বানানোর নিয়ম লেখা থাকে। তাছাড়া বাড়িতেও খাওয়ার স্যালাইন বানানো যায়।

খাওয়ার স্যালাইন বানানোর নিয়ম : একটি পাত্রে আধা লিটার পরিমাণ ফোটানো ঠান্ডা পানি অথবা নিরাপদ নলকূপের পানি নিতে হবে। পরিষ্কার হাতে এক মুঠো গুড় বা চিনি এবং তিন আঙুলের ডগা দিয়ে এক চিমটি লবণ ঐ পানিতে মিশিয়ে চামচ দিয়ে নাড়তে হবে। তাহলেই খাওয়ার স্যালাইন তৈরি হয়ে গেল। এই স্যালাইন অল্প অল্প করে বারবার রোগীকে খাওয়াতে হবে। একবার স্যালাইন তৈরি করে বার ঘন্টার বেশি খাওয়ানো যাবে না।

খাওয়ার স্যালাইন

সংক্রামক রোগ : যে সব রোগ তার বাহকের মাধ্যমে একজনের দেহ থেকে অন্যজনের দেহে পরিবাহিত হয় তাদের সংক্রামক রোগ বলে। সংক্রামক রোগসমূহকে ছোঁয়াচে রোগও বলা হয়। যেমন– বসন্ত, হাম, চর্মরোগ, খোস-পাঁচড়া ইত্যাদি।

বসন্ত : বসন্ত এক প্রকার সংক্রামক ও ছোঁয়াচে রোগ। বসন্ত দুই প্রকার। ক. গুটিবসন্ত, খ. জলবসন্ত।

ক. গুটিবসন্ত : এমন একসময় ছিল যখন মানুষ গুটিবসন্তকে অত্যন্ত ভয় পেত। এ রোগটি অতি দ্রুত বিস্তার লাভ করে। অতীতে প্রতিবছর বহুলোক এ রোগে মারা যেত। বর্তমানে গুটিবসন্তের প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কার হওয়ায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও সরকারের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ থেকে এ রোগ নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে।

খ. জলবসন্ত : গুটিবসন্তের মতো জলবসন্তও একটি সংক্রামক ও ছোঁয়াচে রোগ। গুটিবসন্তের মতো মারাত্মক না হলেও জলবসন্ত কষ্টদায়ক একটি রোগ। কিন্তু এতে মৃত্যুর ঝুঁকি নেই। এক ধরনের ভাইরাস (ভেরিসেলা জোসটার) এ রোগ সৃষ্টি করে। সামান্য সর্দি-জ্বর হয়। সারা দেহে বেদনা ও পরে গুটি দেখা দেয়। গুটি প্রথমে বুকে ও পিঠে বের হয়। ক্রমান্বয়ে হাতে-পায়ে ও মুখ-মন্ডলে বিস্তার লাভ করে। গুটিগুলো নরম ও এর ভিতর পানির ন্যায় তরল পদার্থ থাকে। অস্থিরতা ও গায়ে চুলকানি দেখা দেয়।

প্রতিকার : নখ দিয়ে গুটি চুলকানো উচিত নয়। নিমপাতা সিদ্ধ পানি দিয়ে সারা শরীর মুছে দিলে রোগী আরাম বোধ করে। এ অবস্থায় ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী রোগীর চিকিৎসা করাতে হবে।

প্রতিরোধ : রোগীকে আলাদা ঘরে রাখতে হবে। রোগীর ব্যবহার করা থালাবাসন, বিছানাপত্র অন্য কেউ ব্যবহার করবে না। বিছানাপত্র সোডামিশ্রিত পানি দিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। রোগী সুস্থ হওয়ার পরও দুই–তিন সপ্তাহ বাইরে যাওয়া উচিত নয়।

হাম : সিজেলস ভাইরাস দ্বারা এই রোগ সৃষ্টি হয়। হামে আক্রান্ত শিশুর হাঁচি-কাশি থেকে এই রোগের জীবাণু বাতাসের মাধ্যমে সুস্থ শিশুর দেহে প্রবেশ করে এবং হাম রোগ সৃষ্টি করে। হামে আক্রান্ত শিশুর সংস্পর্শে এলেও এই রোগ হতে পারে।

লক্ষণ : জ্বর, সর্দি–কাশি, চোখ লাল হয়ে যায় এবং পানিতে টলমল করে। মুখের ভেতরে দানা দেখা দেয় ও কণ্ঠস্বর কর্কশ হয়। সারা শরীরে লালচে দাগ দেখা দেয়। দানা কালচে হয়ে একসময় খুসকির মতো হয়ে ঝরে যায়।

প্রতিরোধ : রোগীকে আলাদা করে রাখতে হবে। আক্রান্ত রোগীকে পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে। শিশুর বয়স নয় মাস পূর্ণ হলে এক ডোজ হামের টিকা দিয়ে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা যায়। ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চর্মরোগ : চামড়া দ্বারা আমাদের শরীর আবৃত। সব সময় বাইরের ধুলাবালি, ময়লা প্রভৃতি লেগে লোমকূপের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বিভিন্ন প্রকার চর্মরোগ দেখা দেয়।

খোস-পাঁচড়া : স্কেবিস নামক পরজীবী জীবাণু দ্বারা এ রোগ সংক্রমিত হয়। এটি একটি ছোঁয়াচে রোগও বটে।

রোগীর সংস্পর্শে এই রোগ বিস্তার লাভ করে।

লক্ষণ : প্রথমে আঙুলের ফাঁকে, কোমর, কুঁচকিতে দেখা দেয়। ধীরে ধীরে পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। পরজীবী কীট যেসব জায়গায় লুকিয়ে থাকে, সেখানে ফুসকুড়ি দেখা দেয় ও পেকে যায়। ক্ষতের সৃষ্টি হয়। চুলকানি খুবই তীব্র হয় এবং রাতে ঘুমানো যায় না।

প্রতিরোধ : রোগীকে আলাদা করে রাখতে হবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। নিয়মিত গোসল করা ও গরম পানি দিয়ে ক্ষতস্থান ধুতে হবে। রোগীর ব্যবহার্য দ্রব্যাদি অন্য কেউ ব্যবহার করবে না। ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি : পানিবাহিত ও সংক্রামক রোগ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেবেন। কলেরা, ডায়রিয়া, বসন্ত, হাম, চর্মরোগ, খোস-পাঁচড়ার উৎপত্তি, বিস্তার , লক্ষণ ও প্রতিরোধ সন্বন্ধে বিস্তারিতভাবে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন। শিক্ষার্থীরা শিখতে পেরেছে কি না, বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তা নিশ্চিত হবেন।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দেবেন। প্রতিটি দল নিজেদের মধ্যে কলেরা, ডায়রিয়া, বসন্ত, হাম, চর্মরোগ, খোস-পাঁচড়ার উৎপত্তি, বিস্তার , লক্ষণ ও প্রতিরোধের উপায় নিয়ে আলোচনা করবে। কিছুক্ষণ পর সবাই উপরিউক্ত পানিবাহিত ও সংক্রামক রোগের উৎপত্তি, বিস্তার , লক্ষণ ও প্রতিরোধের উপায়সমূহ কাগজে লিখবে।

মূল্যায়ন :

১. পানিবাহিত রোগ কাকে বলে?
২. খাওয়ার স্যালাইন বানানোর নিয়ম বর্ণনা কর?
৩. জলবসন্ত রোগীর প্রতিরোধে কী করা উচিত?
৪. জলবসন্তের লক্ষণগুলো কী কী?
৫. হাম রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থায় কী করণীয়?
৬. খোস-পাঁচড়া হলে কী করতে হয়?
৭. হাম রোগ কীভাবে বিস্তার লাভ করে?

***পাঠ–০৫* : ডেঙ্গুজ্বর**

শিখনফল :

১.৪.১ ডেঙ্গুজ্বরের উৎপত্তি ও রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে পারবে।

উপকরণ : ডেঙ্গুজ্বর আক্রান্ত রোগীর পোস্টার-জাতীয় ছবি।

বিষয়বস্তু : ডেঙ্গুজ্বর ডেঙ্গু–ভাইরাসজনিত একটি সংক্রামক রোগ। এডিস ইজপসাই মশা এসব ভাইরাসের বাহক। ডেঙ্গুজ্বর সাধারণ দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা–

ক. ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গুজ্বর

খ. হেমোরেজিক ডেঙ্গুজ্বর

রোগ বিস্তার প্রণালি : ডেঙ্গুজ্বরের জীবাণুবাহী এডিস ইজপসাই মশা কোনো ব্যক্তিকে কামড় দিলে সেই ব্যক্তি ৪ থেকে ৬ দিনের মধ্যে ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এবার এই আক্রান্ত ব্যক্তিটিকে জীবাণুবিহীন কোনো এডিস মশা কামড় দিলে সেই মশাটিও ডেঙ্গুজ্বরের জীবাণুবাহী মশায় পরিণত হয়। এডিস মশা সাধারণত দিনের বেলায় বিশেষ করে সকাল ও বিকেলের দিকে কামড়ায়।

এডিস মশা ও বদ্ধ পানিতে ডিম পাড়া

প্রতিকার ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা :

১. রোগীকে মশারির মধ্যে পূর্ণ বিশ্রামে রাখতে হবে।

২. ডেঙ্গু সন্দেহ হলে তাড়াতাড়ি ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

৩. এডিস মশা দমনই হচ্ছে ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধের প্রধান উপায়।

৪. বাসগৃহে ফুলের টব, অব্যবহৃত কৌটা, ড্রাম, নারিকেলের খোসা, গাড়ির টায়ার ইত্যাদিতে জমে থাকা পানিতে এডিস মশা ডিম পারে, এসব পানি জমার স্থান ধ্বংস করতে হবে।

৫. বাড়িঘর ও তার আশপাশ পরিষ্কার করতে হবে।
৬. ঘরে জমে থাকা পানি নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে।
৭. ঘরে স্প্রে করে এডিস মশা ধ্বংস করতে হবে।
৮. দিনে ও রাতে ঘুমানোর সময় মশারি ব্যবহার করতে হবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ডেঙ্গুজ্বর কী ? এর বিস্তার, লক্ষণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধ সম্বন্ধে ধারণা প্রদান করবেন। বিভিন্ন প্রশ্ন করে তাদের ধারণা আরও স্পষ্ট করে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে প্রতিটি দল নিজেদের মধ্যে ডেঙ্গুজ্বর, এর বিস্তার, লক্ষণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধ সম্বন্ধে আলোচনা করবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যদি কেউ ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয়ে থাকে তাহলে তার অভিজ্ঞতা সবাইকে শোনাবে।

মূল্যায়ন :
১. ডেঙ্গুজ্বর কী?
২. ডেঙ্গুজ্বরের লক্ষণগুলো বর্ণনা কর?
৩. ডেঙ্গুজ্বর কীভাবে বিস্তার লাভ করে?
৪. ডেঙ্গুজ্বরের প্রতিকার ও প্রতিরোধ করণীয় কী?
৫. ডেঙ্গুজ্বর কী মশা দ্বারা ছড়ায়?

দ্বিতীয় অধ্যায়

খেলাধুলার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

২.১ মার্চপাস্ট করে সালাম প্রদান করবে।

২.২ শরীরচর্চা (জিমন্যাস্টিক) মূলক ব্যায়াম সামনে ডিগবাজি, পেছনে ডিগবাজি, কার্ট হুইল, হ্যান্ডস্ট্যান্ড ইত্যাদি সঠিকভাবে অনুশীলন ও প্রদর্শন করতে পারবে।

২.৩ সরঞ্জামসহ খেলাধুলা।

ক. অন্তঃকক্ষ খেলাধুলা (ক্যারাম, দাবা) অনুশীলনীর মাধ্যমে পারদর্শিতা অর্জন ও মানসিক আনন্দ লাভ করতে পারবে।

খ. বহিরাঙ্গন খেলা (ক্রিকেট, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, হ্যান্ডবল) অনুশীলনের মাধ্যমে পারদর্শিতা অর্জন ও মানসিক আনন্দ লাভ করতে পারবে।

শিখনফল :

২.১.১ মার্চপাস্ট করে সালাম দিতে পারবে।

২.২.১ সামনে পেছনে ডিগবাজি দিতে পারবে।

২.২.২ কার্ট হুইল ও হ্যান্ডস্ট্যান্ড করতে শিখবে।

২.৩.১ ক. অভ্যন্তরীণ খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করবে।

খ. বহিরাঙ্গন খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করবে।

পাঠ বিভাজন– ৭

পাঠ–০১ : মার্চপাস্ট ও সালাম প্রদান

শিখনফল :

২.১.১ মার্চপাস্ট করে সালাম দিতে পারবে।

উপকরণ : মাঠ, প্ল্যাকার্ড, দন্ডসহ পতাকা

বিষয়বস্তু : একজন দলনেতা এবং কয়েকটি দল বা হাউস থাকবে। প্রতি দলে তিনটি করে লাইন ও একাধিক ফাইল থাকবে। একসঙ্গে লাইন করে আলাদাভাবে প্রতিটি দল দাঁড়াবে। প্রতি দলে একজন কমান্ডার, একজন প্ল্যাকার্ড বহনকারী এবং একজন পতাকা বহনকারী থাকবে। প্রধান দলনেতা কমান্ড দেবে প্যারেড– সাবধান হবে– সা–ব–ধান। তখন সবাই সাবধান হবে। এবার প্রধান দলনেতা মার্চপাস্টের মাধ্যমে ডায়াসের সামনে যেয়ে প্রধান অতিথিকে সালাম দেবে এবং বলবে, মার্চপাস্টের জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থী স্যার। তিনি অনুমতি দেয়ার পর প্রধান দলনেতা এক কদম পেছনে এসে সালাম দেবে এবং উল্টা ঘুরে মার্চ পাস্ট করে নিজ জায়গায় এসে দাঁড়াবে। প্রধান দলনেতা কমান্ড দেবে– প্যারেড–ডানে ঘুরবে– ডা–নে ঘোর। সব দলই তখন ডানে ঘুরবে। প্রধান দলনেতা, দলীয় দলনেতা, দলীয় প্ল্যাকার্ড বহনকারী ও দলীয় পতাকা বহনকারী সকলেই ডানে ঘুরবে এবং নিজ নিজ দলের সামনে ধারাবাহিকভাবে দাঁড়াবে। প্রধান দলনেতা সবগুলো দলের সামনে যে দিক থেকে মার্চপাস্ট আরম্ভ করবে সেখানে এসে দাঁড়াবে। এবারে প্রধান দলনেতা কমান্ড করবে– প্যারেড বামে থেকে সামনের দিকে জলদি চল। সবাই চলতে শুরু করবে। ডায়াসের সামনে আসার পর প্রধান অতিথির সম্মুখে এসে প্রধান দলনেতা কমান্ড করবে– প্যারেড ডানে দেখবে– ডা–নে দেখ। এরপর পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক দলনেতা কমান্ড করবে ডা–নে দেখ। ডানে দেখ কমান্ডের সাথে সাথে সকলে তাদের ডান দিকে তাকাবে এবং দুই হাত মুভমেন্ট থেকে বিরত রাখবে, শুধু পায়ের মুভমেন্ট চলবে। ডায়াস পার হয়ে যাবার পর প্রধান দলনেতা ও দলীয় দলনেতা সবাই নিজ নিজ কমান্ড করবে। সামনে –দেখবে– সাম–নে দেখ। তখন সবাই সামনের দিকে তাকাবে এবং পূর্বের ন্যায় মুভমেন্ট শুরু করবে। তারপর দলনেতা সবাই নির্দিষ্ট জায়গায় এসে কমান্ড করবে–প্যারেড–এবার থামবে–এবার– থাম–চেক–হোল্ড–ওয়ান–টু বলে মার্চপাস্ট শেষ করবে।

শিখন শেখানো কার্যবলি : শিক্ষক প্রথমে সকলের সামনে মার্চপাস্ট ও সালাম প্রদান কীভাবে করতে হয় তা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেবেন। এ সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট হয়েছে কি না, তা জানার জন্য বিভিন্ন প্রশ্ন করবেন। অস্পষ্টতা থাকলে পুনরায় বলে বুঝিয়ে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে মার্চপাস্ট ও সালাম প্রদানের অনুশীলন করবে। কিছুক্ষণ অনুশীলনের পর শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে একজনকে প্রধান অতিথি, প্রধান দলনেতা, দলনেতা, প্ল্যাকার্ড বহনকারী, পতাকা বহনকারী এবং কয়েকটি দলে ভাগ করে মার্চপাস্টের মহড়া দেবে।

মূল্যায়ন :

ক. মার্চপাস্ট কীভাবে করতে হয়?

খ. মার্চপাস্ট ও সালাম প্রদান করা কখন প্রয়োজন হয়?

গ. সালাম কীভাবে দিতে হয়?

ঘ. প্রধান দলনেতার কাজ কী?

ঙ) প্রধান অতিথির সামনে গিয়ে প্রধান দলনেতা ও দলনেতা কী বলে কমান্ড দেয়?

পাঠ– ০২ : সামনে– পেছনে ডিগবাজি, কার্ট হুইল ও হ্যান্ডস্ট্যান্ড

শিখনফল :

২.২.১ সামনে পেছনে ডিগবাজি দিতে পারবে।

২.২.২ কার্ট হুইল ও হ্যান্ডস্ট্যান্ড করতে শিখবে।

উপকরণ : মাঠ, ব্যায়ামাগার, ম্যাট

বিষয়বস্তু : ডিগবাজি– শরীরকে বিভিন্ন অবস্থানে রেখে ডিগবাজি দেয়া যায়। যেমন– সামনে-পেছনে ডিগবাজি, এগুলো অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্ত করলে শরীরের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা, ক্ষীপ্রতা ও নমনীয়তা বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন ধরনের কঠিন ব্যায়াম করার সাহস অর্জন করা যায়।

সামনে ডিগবাজি : ম্যাটে বা মাটিতে দুই হাঁটু ভাঁজ করে দুই পায়ের পাতা এবং দুই হাতের তালুর উপর ভর করে থাকতে হবে। এবার কোমর উপরে তুলে ঘাড় ও মাথা নিচু করে দুই হাতের মাঝখান দিয়ে ঢুকিয়ে আস্তে আস্তে সামনে গড়িয়ে পড়বে। শরীর গড়ানোর সময় প্রথম ম্যাটে বা মাটিতে ঘাড় স্পর্শ করবে। এ সময় ঘাড় ও হাতের উপর দেহের সম্পূর্ণ ওজন থাকবে। পা মেঝে স্পর্শ করার সাথে সাথে দুই পায়ের উপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে।

পেছনে ডিগবাজি : পেছনে ডিগবাজির সময় যেদিকে গড়াবে সেদিকে পিঠ রেখে দাঁড়াবে। অর্ধ বসার ভঙ্গিতে হাঁটু ভাঁজ করে বসে এবং হিপ (নিতম্ব) মেঝেতে বা ম্যাটে লাগার সাথে সাথে দুই হাতের তালু উপরের দিকে রেখে ঘাড়ের পেছনে এনে শরীরটা পেছনে ঘুরিয়ে দিতে হবে। কোমর থেকে শরীরের উপরের অংশ তুলে দাঁড়াবার জন্য পা মাটি ছোঁয়ার সাথে সাথে হাতের তালু দিয়ে মাটিতে ধাক্কা দিতে হবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে।

কার্ট হুইল : পরস্পর দুই হাতে ও দুই পায়ে ভর করে গরুর গাড়ির চাকার মতো শরীরটা ঘুরিয়ে আনা। যারা ডান হাত প্রথমে মাটিতে ফেলবে তারা ডান কাঁধকে সামনে রেখে দুইহাত উপরে তুলে দুই পা ফাঁক করে দাঁড়াবে। কোমর থেকে শরীরের ওপরের অংশ ভেঙে ডান হাত ও ডান কাঁধকে খুব দ্রুত নিচের দিকে আনতে হবে এবং ডান হাতকে ডান পায়ের দেড় ফুট পরিমান সামনে রাখতে হবে। বাম হাতকে ডান হাতের লাইনেই সামনের দিকে কাঁধ সমান দূরত্বে এনে মেঝেতে রাখবে। কোমর সোজা করে ওপরে তুলে বাম পায়ের উপর নামাবে এবং সোজা করে নেবে। হাত ও পা কখনো বাঁকা হবে না এবং সোজা এক লাইনে দ্রুত চলতে থাকবে।

হ্যান্ডস্ট্যান্ড : বাম পা-কে সামনে রেখে কোমর ভেঙে দুই হাত সামনে মাটিতে রাখবে। হাতের আঙুলগুলো সামনের দিকে করে দুটো হাতের মধ্যে কাঁধ সমান দূরত্ব রেখে হাঁটু ভেঙে বসবে। মাথা নিচের দিকে নিয়ে ডান পাটিকে উপরের দিকে ছুড়ে দেবার সাথে সাথে বাম পা দিয়ে মাটিতে ধাক্কা মেরে ডান পাটি উপরের দিকে তুলবে। সাহায্যকারী পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করবে, যাতে পড়ে না যায়। এভাবে সঙ্গীর বা দেয়ালের সাহায্য নিয়ে হাতের উপর দাঁড়িয়ে সমতা রাখার চেষ্টা করবে। এ অবস্থা থেকে কনুই ভেঙে, মাথাকে দুই হাতের ভেতরের দিকে এনে শরীরকে বাঁকা করে পিঠের উপর দিয়ে সামনের দিকে গড়িয়ে যাবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি : শিক্ষার্থীদের সামনে শিক্ষক প্রথমে সামনে পেছনে ডিগবাজি, কার্ট হুইল ও হ্যান্ডস্ট্যান্ড করার পদ্ধতি পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করবেন। খেলাধুলায় উৎসাহী ও পারদর্শী এমন একজন শিক্ষার্থীকে ডেকে নেবেন। তারপর শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী করে দেখাতে বলবেন। যদি কোনো সংশোধনের প্রয়োজন হয় সাথে সাথেই সেটি করে দেবেন। হ্যান্ডস্ট্যান্ড করার সময় সাহায্যকারী হিসেবে শিক্ষক নিজে থাকবেন।

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী সতর্কতার সাথে অনুশীলন করবে।এ ভাবে অনুশীলন চালিয়ে যাবে এবং পারদর্শিতা অর্জন করবে।

মূল্যায়ন :

১. সামনে ডিগবাজি দেয়ার কৌশল বর্ণনা কর।

২. পেছনে ডিগবাজি দেয়ার সময় শরীরের সামনের অংশ কোন দিকে থাকবে।

৩. কার্ট হুইল বলতে কী বোঝায়?

৪. কার্ট হুইল করার কৌশল বর্ণনা কর।

৫. হ্যান্ডস্ট্যান্ড অর্থ কী?

৬. হ্যান্ডস্ট্যান্ডের কৌশল বর্ণনা কর ।

পাঠ –০৩ : অভ্যন্তরীণ খেলা (ক্যারাম, দাবা)।

শিখনফল :

২.৩.১ অভ্যন্তরীণ খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করবে।

উপকরণ : ক্যারাম বোর্ড, ঘুঁটি, একটি স্ট্রাইকার, টেবিল বা স্ট্যান্ড, বোরিক পাউডার, দাবা বোর্ড, ঘুঁটি।

বিষয়বস্তু : ক্যারাম – গ্রাম কিংবা শহর সর্বত্রই ক্যারাম খেলার প্রচলন আছে। একক বা দ্বৈতভাবে দুই দলে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। একক খেলায় উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী মুখোমুখি অবস্থান নেয়। অন্য দিকে দ্বৈত খেলায় সহযোগী খেলোয়াড় পরস্পর মুখোমুখি অবস্থান নেয়।

খেলার পদ্ধতি : সার্কেলের মধ্যখানে রেড বসিয়ে তার চারদিকে পর্যায়ক্রমে সাদা ও কাল ঘুঁটি বসাতে হবে। প্রথম কে স্ট্রাইক করবে তা টসের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। ব্রেক গ্রহণকারী খেলোয়াড় সাদা ঘুঁটি এবং বিপক্ষ কালো ঘুঁটি নিয়ে খেলবে। রেড থাকবে উভয় দলের জন্য সমান উন্মুক্ত। স্ট্রাইকারে আঙুল দিয়ে আঘাত করতে হবে। যে হাত দিয়ে খেলবে সে হাতের কনুই বোর্ডের উপরিভাগে আসতে পারবে না। ঘুঁটি এবং রেড-এর পয়েন্ট হচ্ছে যথাক্রমে ১ ও ৩। রেড পকেটে ফেলার পর কভারিংয়ের জন্য তাকে আর একটি স্বীয় ঘুঁটি পকেটে ফেলতে হবে। বোর্ড শেষে বিপক্ষের যত ঘুঁটি বোর্ডে থাকবে সে তত পয়েন্ট পাবে। কভারিং সহ বেড ফেলতে পারলে অতিরিক্ত ৩ পয়েন্ট পাবে। এভাবে যে বা যে পক্ষ সর্বপ্রথম ২৫ পয়েন্ট অর্জন করবে সে বা সেপক্ষ জয়লাভ করবে। মোট তিন গেমের মধ্যে যে খেলোয়াড় বা যে দল দুই গেমে জয়ী হবে, সে বিজয়ী হবে।

দাবা : দাবা বর্তমান যুগে এক চমকপ্রদ বুদ্ধির খেলা। সব বয়সের ছেলেমেয়েরা দাবা খেলে তাদের অবসর সময় উদযাপন করে। পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই এ খেলা জনপ্রিয়। বাংলাদেশেও এ খেলার বেশ জনপ্রিয়তা

রয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কমনরুমে একটু সময় পেলেই শিক্ষক ছাত্র-সবাই দাবা নিয়ে বসে। বাংলাদেশে দাবা ফেডারেশন গঠিত হওয়ার পর থেকে এ খেলার প্রসারের জন্য পরিশ্রম করে যাচ্ছে স্বাধীনতার পর থেকে।

সাধারণ নিয়মাবলি :

১. দাবা খেলার বোর্ডে ডান দিকে সাদা ঘর তারপর কালো—এভাবে একটির পর একটি সাদা-কালো ঘর নিয়ে পাশাপাশি এক লাইনে মোট ৮টি ঘর থাকে। দাবা বোর্ডে সর্বমোট ৬৪টি ঘর আছে।

২. দাবা বোর্ড সামনে নিয়ে বসার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে নিজের দিকের ডান দিকের ঘরটা যেন সাদা হয়।

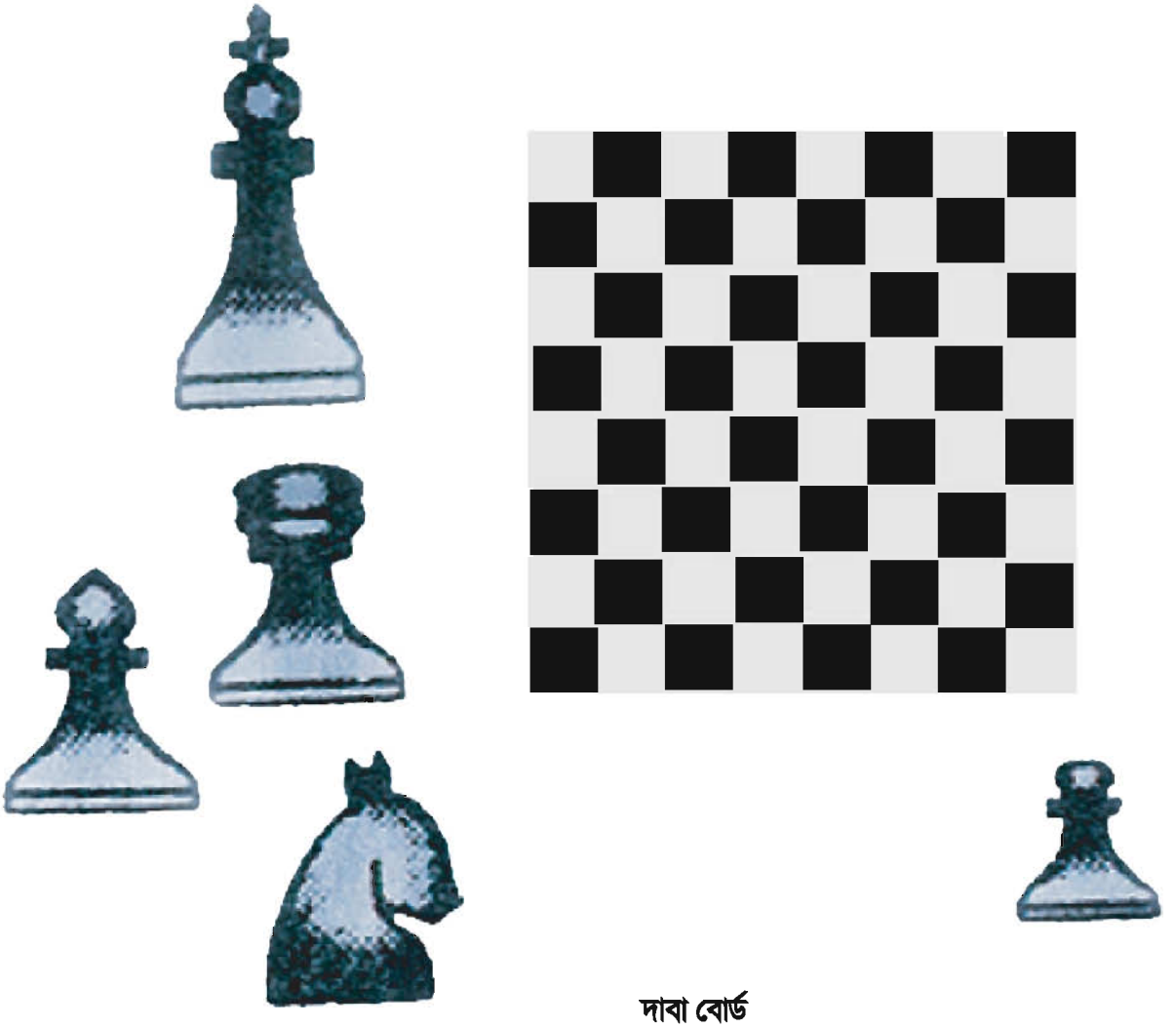

দাবা বোর্ড

৩. প্রথমে দুই পাশের দুইকোনার ঘরে দুই নৌকা বসবে। তারপর একইভাবে দুই পাশে দুইঘোড়া ও দুই হাতি বসাতে হবে। মাঝে যে দুইটি ঘর খালি থাকবে সেখানে সাদা ঘরে সাদা মন্ত্রী বসবে। শেষে যে ঘরটি থাকবে তাতে রাজা বসবে। এসবের সামনের ঘরগুলোতে প্রতিটিতে একটি করে বড়ে বসাতে হবে।

৪. বড়ে প্রথম চাল দেয়ার সময় এক ঘর বা এক সাথে দুই ঘর এগোতে পারে যদি সামনে কোনো বাধা না থাকে। বড়ে সব সময় সামনে এগোবে কিন্তু কোনাকোনি অন্যের ঘুঁটি মারবে। হাতি সব সময় কোনাকোনি চলবে। ঘোড়া আড়াই ঘর করে এগোবে অর্থাৎ যদি সামনের দিকে যায় তবে সামনে দুইঘর গিয়ে পাশে এক ঘর অথবা পাশে গেলে পাশে দুই ঘর নিয়ে সামনে এক ঘর এ ভাবে ঘোড়া চারদিকে চলতে পারে। মন্ত্রী সামনা-সামনি, কোনাকোনি, পাশাপাশি চারদিকেই চলতে পারে। রাজাও মন্ত্রীর ন্যায় চারদিকে চলতে পারে, তবে মাত্র একটি ঘর।

৫. টসের মাধ্যমে কে সাদা কে কালো নেবে তা নির্ধারণ হয়ে থাকে।

৬. সাদা-কালো নিয়ে মোট ৩২টি ঘুঁটি থাকে।

	সাদা	কালো	মোট
রাজা	১	১	২টি
মন্ত্রী	১	১	২টি
হাতি	২	২	৪টি
ঘোড়া	২	২	৪টি
নৌকা	২	২	৪টি
বড়ে	৮	৮	১৬টি
			মোট ৩২ টি

৭. তিন গেমে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়।

৮. ক্যাসলিং – কিস্তি বাঁচানোর জন্য রাজা ও নৌকার মধ্যে জায়গা বদলের মাধ্যমে যে চাল দেয়া হয় তাকে ক্যাসলিং বলে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি : ক্যারাম ও দাবা খেলার নিয়মাবলি স্পষ্টভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করবেন এবং ক্যাসলিং করার নিয়ম বুঝিয়ে দেবেন। শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝতে পেরেছে, বিভিন্ন প্রশ্ন করে তা জেনে নেবেন। অস্পষ্টতা থাকলে পুনরায় বলে পরিষ্কার করে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা দুইটি দলে ভাগ হয়ে একদল ক্যারাম ও অন্যদল দাবা খেলার নিয়মাবলি সম্বন্ধে নিজেদের আলোচনা করবে। এরপর সক্রিয়ভাবে ক্যারাম ও দাবা খেলায় অংশগ্রহণ করবে। সবাই যেন খেলতে পারে, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। এভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাবে গড়ে উঠবে।

মূল্যায়ন :

১. ক্যারাম খেলায় কত রঙের ঘুঁটি থাকে?

২. রেড-এর পয়েন্ট কত?

৩. বিজয়ী কীভাবে নির্ধারিত হয়?

৪. দাবা খেলার ঘুঁটিগুলো কী নামে পরিচিত?

৫. ক্যাসলিং কাকে বলে?

৬. বিভিন্ন ঘুঁটির চাল দেয়ার নিয়ম বর্ণনা কর।

পাঠ– ০৪ : খ. বহিরাঙ্গন খেলা– ক্রিকেট

শিখনফল :

২.৩.১ বহিরাঙ্গন খেলা– ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করবে।

উপকরণ : খেলার মাঠ, ব্যাট, প্যাড, স্ট্যাম্প, ২টি বেল, টেনিস বল, গ্লাভস।

বিষয়বস্তু : ক্রিকেট খেলার জন্ম ইংল্যান্ডে। প্রথম অবস্থায় কোনো রকম উইকেট পোঁতা হতো না। গোল করে একটি ছোট গর্ত করে নেয়া হতো। ১৭০০ সাল থেকে উইকেট পুঁতে ক্রিকেট খেলার প্রচলন হয়। পৃথিবীতে দিন দিন ক্রিকেট খেলার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশেও এখন প্রচুর জনপ্রিয়তা রয়েছে। শহর ছাড়া গ্রামগঞ্জে এখন ক্রিকেট খেলা হয়ে থাকে।

সাধারণ নিয়মাবলি :

১. পিচ– ক্রিকেট খেলার পিচ ছোটদের জন্য দৈর্ঘ্যে ২০ গজ (১৮.২৯) মিটার এবং প্রস্থে ৮ ফুট ৮ ইঞ্চি (২.৫০) মিটার।

২. ক্রিকেট খেলার মাঠ সাধারণত ডিম্বাকৃতির হয়ে থাকে। পিচের ঠিক মধ্য থেকে ৫৯.৪৩ মিটার (৬৫ গজের) ব্যাসার্ধ নিয়ে চাপ টানলে যে ক্ষেত্রটি হয় সেটিই ক্রিকেটের সবচেয়ে ছোট মাঠ।

৩. এগারো জন খেলোয়াড় একটি দলে খেলে থাকে।

৪. আম্পায়ারের টসের মাধ্যমে নির্ধারিত হয় কোন দল ব্যাট করবে আর কোন দল ফিল্ডিং করবে।

৫. খেলা পরিচালনা করেন দুজন আম্পায়ার এবং একজন স্কোরার।

৬. ৬টি বলে একটি ওভার হয়। একজন পর পর ৬টি (এক ওভার) বল করার পর অন্যজন বল করে। ওভার শেষ হলে বোলার উইকেটের প্রান্ত বদল করে থাকে।

৭. ব্যাটসম্যানের ব্যাট থেকে আসা বল মাঠের সীমানা পার হলেই চার রান এবং শূন্যে দিয়ে সরাসরি সীমানার বাইরে পড়লে ছয় রান হয়। ব্যাটসম্যানের শরীর বা প্যাড থেকে কিংবা কোনো কিছু স্পর্শ না করে বল বেরিয়ে গেলে বাই রান হয়।

৮. উইকেট– পিচের দুইদিকে তিনটি করে স্ট্যাম্প দিয়ে দুটি উইকেট তৈরি করা হয়। উইকেটের চওড়া হয় নয় ইঞ্চি। উইকেটের উপরে দুটি বেল থাকে। বেলসহ মাটি থেকে উইকেটের উচ্চতা ২ ফুট ৪.৫ ইঞ্চি।

৯. বোলিং ও পপিং ক্রিজ– উইকেটের সাথে একই রেখায় বোলিং ক্রিজের দৈর্ঘ্য হবে ৮ ফুট ৮ ইঞ্চি। বোলিং ক্রিজের সামনে ৪ ফুট বা ১.২২ মিটার সমান্তরালভাবে রেখা টানা হবে, যার নাম পপিং ক্রিজ।

১০. ওয়াইড বল– আম্পায়ারের মতানুসারে বল যদি ব্যাটসম্যানের নাগালের বাইরে দিয়ে যায় তাহলে ওয়াইড বল হয়।

১১. নো বল–বল করার সময় বোলার বলটি ছুড়ে মারলে, সামনের পা সম্পূর্ণভাবে পপিং ক্রিজের বাইরে গেলে, এবং পেছনের পা রিটার্ন ক্রিজের মধ্যে না থাকলে নো বল হয়।

১২. ক্রিকেট খেলায় নিম্নলিখিত কারণে একজন ব্যাটসম্যান আউট হয়–

ক. বোল্ড আউট–বোলারের শুদ্ধ বল যদি উইকেটে লেগে বেল পড়ে যায়।

খ. রান আউট–রান নেয়ার সময় পপিং ক্রিজে পৌঁছার পূর্বেই যদি ফিল্ডার কর্তৃক ছুড়ে দেয়া বল উইকেট ভেঙে দেয়।

গ. ক্যাচ আউট– ব্যাটসম্যানের আঘাত করা বল মাটি স্পর্শ করার আগেই যদি ফিল্ডার ধরে ফেলে।

ঘ. হিট উইকেট– বল খেলতে গিয়ে যদি ব্যাট বা শরীরের কোনো অংশের স্পর্শ লেগে উইকেট ভেঙ্গে যায়।

ঙ. স্ট্যাম্পড আউট– বল মারতে গিয়ে ব্যাটসম্যান যদি পপিং ক্রিজের বাইরে চলে যায় তখন উইকেটরক্ষক সরাসরি বল ধরে বেল ফেলে দেয়।

চ. এল বি ডব্লিউ– আম্পায়ার যদি মনে করেন বল ব্যাটসম্যানের পায়ে বা শরীরে প্রতিহত না হলে সরাসরি স্ট্যাম্পে আঘাত করত তখন তাকে এল বি ডব্লিউ আউট দিতে পারেন।

ছ. টাইমড আউট– নতুন ব্যাটসম্যান ৩ মিনিটের মধ্যে মাঠে প্রবেশ না করলে। এই আউটের আওতায় পড়বে। তবে ৩ মিনিটের পরিবর্তে ২ মিনিট করার প্রস্তাব আছে।

জ. হ্যান্ডেল দি বল– হাত দিয়ে বল স্পর্শ করলে।

ঝ. হিট দি বল টুয়াইস– ব্যাটসম্যান ব্যাট করার পর দ্বিতীয়বার বলে আঘাত করলে।

ঞ. অবস্ট্রাকটিং দি ফিল্ড– ব্যাটসম্যান যদি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে ফিল্ডিং এ বাধা প্রদান করে।

১৩. ম্যাচ– ক্রিকেট খেলায় সাধারণ তিন ধরনের ম্যাচ হয়।

ক. টেস্ট ম্যাচ খ. ওয়ান ডে ম্যাচ গ. টি–২০ ম্যাচ

ক. টেস্ট ম্যাচ– টেস্ট ম্যাচ দুই ইনিংসে খেলা হয়ে থাকে। প্রতি দলই পর্যায়ক্রমে দুই বার ব্যাট করার সুযোগ পায়।

খ. ওয়ান ডে ম্যাচ–এই ম্যাচে ৫০ ওভারের ভিত্তিতে খেলা হয় এবং প্রত্যেক দল মাত্র একবার ব্যাট ও বল করে।

গ. টি–২০ ম্যাচ–এই ম্যাচে ২০ ওভার করে একেক দল ব্যাট ও বল করার সুযোগ পাবে।

কলাকৌশল :

ব্যাটিং–ব্যাট দিয়ে বল খেলাটা ক্রিকেটের গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। ব্যাটিং ভালোভাবে করতে হলে–ব্যাট ধরা ব্যাট নিয়ে ক্রিজে দাঁড়ানো, ব্যাট পেছনে তোলা এবং ব্যাট দিয়ে বিভিন্নভাবে বলকে মারার কৌশল আয়ত্ব করতে হবে।

ব্যাট ধরা– উভয় হাতের তর্জনী এবং বুড়ো আঙুল দ্বারা তৈরি 'ভি' দুটি এক্ষেত্রে একই সরলরেখায় থাকবে। হাতলের মাঝ বরাবর অবস্থান করবে হাতের কবজি। উভয় হাতের মাঝে কোনো ফাঁক থাকবে না।

ক্রিজে দাঁড়ানো– ব্যাটসম্যানের কাঁধ বোলারমুখী হয়ে থাকবে। মাথা পিঠ বরাবর নামিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে

বলের ওপর নজর রাখতে হবে। দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা এতটাই স্বাচ্ছন্দ্য হওয়া উচিত, যাতে করে শরীরের ভারসাম্য দুটি পায়ের উপর থাকে।

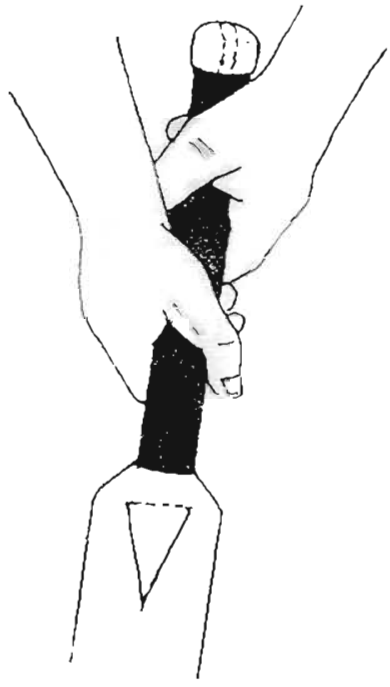

ব্যাট ধরা

ব্যাট পেছনে তোলা– প্রতিটি স্ট্রোকের ক্ষেত্রেই ব্যাক লিফট অর্থাৎ ব্যাট পেছনে তোলা একটি অন্যতম প্রধান অংশ। স্ট্যাম্পের ঠিক ওপরে ব্যাট ধরতে হবে।

বল মারা বা স্ট্রোক – সামনে এগিয়ে গিয়ে যখন আত্মরক্ষামূলক স্ট্রোক করা হয়, তখন তাকে ফরওয়ার্ড ডিফেন্সিভ স্ট্রোক বলে। পেছনে সরে গিয়ে যখন বলটিকে আত্মরক্ষামূলক স্ট্রোক করা হয়, তখন তাকে ব্যাকওয়ার্ড ডিফেন্স স্ট্রোক বলে।

যখন পপিং ক্রিজের বেশ সামনে এক পা এগিয়ে দিয়ে বল দূরে পাঠাবার জন্য সজোরে মারা হয়, তখন তাকে ফরওয়ার্ড ড্রাইভ বলে। আবার খানিকটা পেছনে এসে যখন উপরোক্তভাবে বলে স্ট্রোক করতে হয়, তখন তাকে ব্যাকওয়ার্ড ড্রাইভ বলে।

বোলিং :

বল ধরা– বোলিং করার সময় বলটাকে হাতের দুই আঙুলের মাথা দিয়ে ধরতে হবে। বল হাতের তালুতে ধরা যাবে না।

বল নিয়ে দৌড়ে আসা– কী ধরনের বল করবে, তার ওপর নির্ভর করবে কতটুক দূরত্ব নিয়ে দৌড়াতে হবে। বল নিয়ে দৌড়ানোর সময় শরীরের ভারসাম্য খানিকটা সামনের দিকে ও মাথাকে স্থির রাখতে হবে।

বল হাত থেকে ছোঁড়া– বল হাত ছাড়ার আগমুহূর্তে বাম পায়ের ওপর লাফ দিয়ে শরীরটাকে পাশের দিকে ঘুরিয়ে নিতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ডান পা-কে সামনে নিয়ে যেতে হবে। ডান হাত মুখের কাছাকাছি ও বাম হাত সোজা ওপরের দিকে থাকবে। দৃষ্টি ব্যাটসম্যানের ওপর রাখতে হবে।

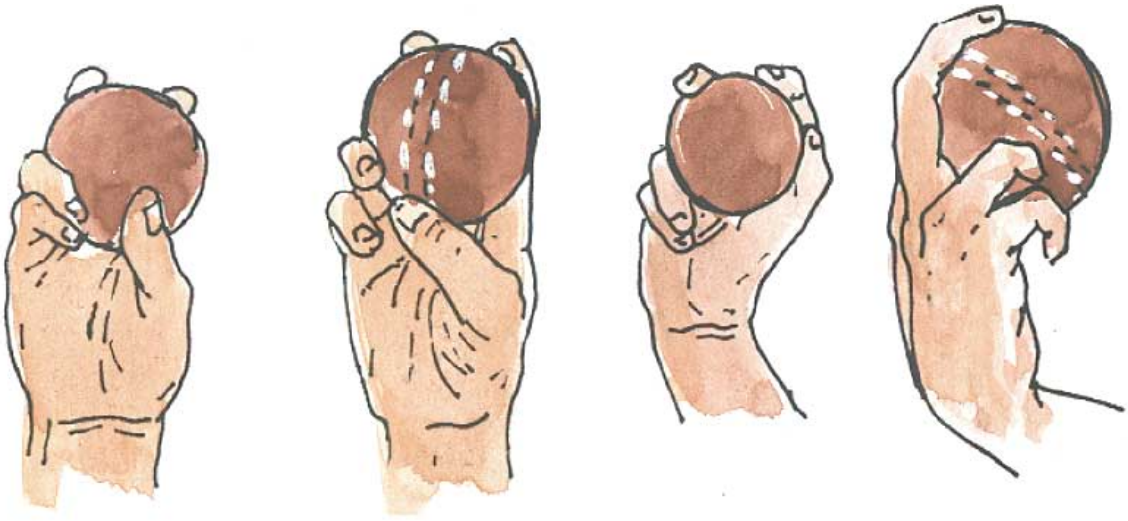

বোলিং গ্রিপ

অনুসরণ করা (ফলো থ্রো) – ডান কাঁধ ব্যাটসম্যানের দিকে থাকবে। ডান হাত বাঁ পায়ের পাশ দিয়ে পেছনে নিয়ে যেতে হবে। বল ছোড়ার পর দৃষ্টি বলের দিকে থাকবে।

ফিল্ডিং :

রক্ষণাত্মক ফিল্ডিং– ব্যাটসম্যানরা যাতে বেশি রান নিতে না পারে, তা বন্ধ করার জন্যই মাঠে বল থামানো হয়। উঁচু দিয়ে আসা বল ধরার জন্য দুইহাতের তালু খোলা রেখে হাত সামনে এগিয়ে দিতে হবে। বল ধরে সাথে সাথে আঙুলগুলো বন্ধ করে বুকের কাছে টেনে নিতে হবে।

আক্রমণাত্মক ফিল্ডিং – বল থামানোর সাথে সাথে কত তাড়াতাড়ি সেটা উইকেটকিপার বা উইকেটে লাগানো যায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। দূরে বল পাঠাতে হলে বাহু কাঁধের উপর দিয়ে বল নিক্ষেপ করতে হবে।

উইকেট কিপিং– উইকেটরক্ষককে উইকেটের পেছনে শরীরের ওজন সমানভাবে দুইপায়ের উপর রেখে অর্ধ বসার ভঙ্গিতে বোলিং এর সময় সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি : শিক্ষক ক্রিকেট খেলার নিয়মাবলি ও শিক্ষার্থীদের মাঠে নিয়ে হাতে-কলমে বুঝিয়ে দেবেন। গ্রুপ করে অনুশীলন করতে বলবেন। ক্রিকেটের কৌশল সম্পর্কে তাদের জ্ঞান অর্জিত হয়েছে কি না-তা বিভিন্ন প্রশ্ন করে শিক্ষক নিশ্চিত হবেন। জ্ঞান অর্জনে ঘাটতি থাকলে শিক্ষক পুনরায় শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা ক্রিকেট খেলার নিয়মাবলি ও কৌশল সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে।

তারপর মাঠে গিয়ে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে ক্রিকেট খেলায় অংশগ্রহণ করবে। খেলায় সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে ক্রিকেট খেলায় পারদর্শী হয়ে উঠবে।

মূল্যায়ন :

১. ক্রিকেটের পিচ বলতে কী বোঝায়?

২. নো বল কখন হয়?

৩. এল বি ডব্লিউ কী?

৪. ব্যাটিং করার কৌশল বর্ণনা কর?

৫. বল কীভাবে ধরতে হয়?

৬. কয়টি বলে এক ওভার হয়?

পাঠ – ০৫ : ফুটবল

শিখনফল :

২.৩.১ ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণ করবে।

উপকরণ : খেলার মাঠ, গোলপোস্ট, জাল, বল, ফ্ল্যাগ, বাঁশি।

বিষয়বস্তু : ফুটবল একটি আনন্দদায়ক ও জনপ্রিয় খেলা। এ খেলায় শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং তেজ ও ক্ষিপ্রতা, শৃঙ্খলাবোধ ও নেতৃত্বের মনোভাব গড়ে ওঠে। ফুটবল খেলায় ১৭টি আন্তর্জাতিক নিয়ম রয়েছে। তবে এ বয়সের ছাত্রদের আন্তর্জাতিক সব কটি আইন জানা প্রয়োজন নেই। কিছু কিছু সারাধণ নিয়ম জানা দরকার, এখানে তার উল্লেখ করা হলো–এ বয়সের ছাত্রদের জন্য খেলার মাঠ সাধারণত ৮০ × ৫০ গজ হয়ে থাকে। এর কমবেশি হলেও খেলা যায়। ৩ নং বল এবং মাটি থেকে ৮ ফুট উঁচু ও ১২ ফুট লম্বা গোলপোস্ট দরকার। ১১ জন সমন্বয়ে একটি দল গঠিত হয়, তবে ৯ জন অথবা কমপক্ষে ৭ জনেও খেলা যায়।

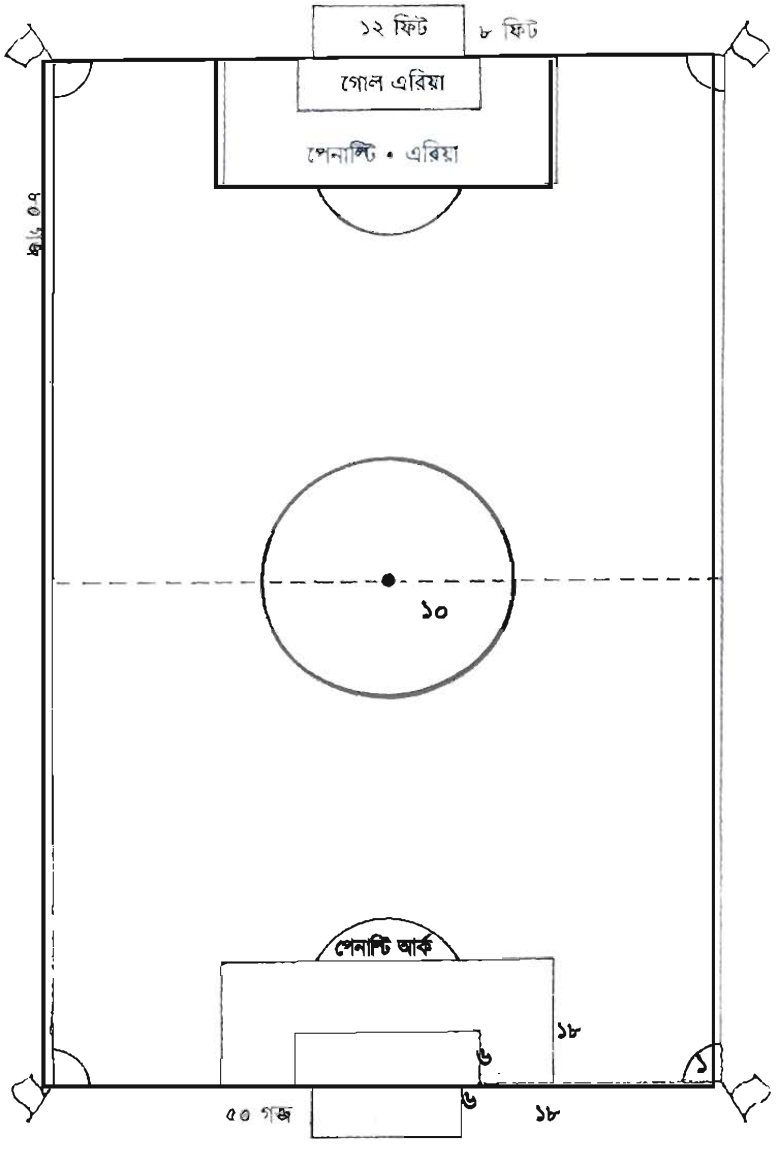

ফুটবল খেলার মাঠ

সাধারণ নিয়মাবলি :

ক) ফুটবল পরিচালনার জন্য একজন রেফারি, ২ জন ডেপুটি রেফারি এবং একজন ৪র্থ রেফারি প্রয়োজন পড়ে। ফুটবল বিভিন্ন পদ্ধতিতে খেলা হয়ে থাকে। যেমন ৪–২–৪, ৪–৩–৩ ও ৪–৪–২ পদ্ধতি। ৪–২–৪ পদ্ধতি বলতে ৪ জন ব্যাক– ২ জন হাফব্যাক– ৪ জন ফরওয়ার্ড। ৪–৩–৩ বলতে ৪ জন ব্যাক, ৩ জন হাফ ব্যাক– ৩ জন ফরওয়ার্ড। ৪–৪–২ পদ্ধতি বলতে ৪ জন ব্যাক–৪ জন হাফব্যাক– ২ জন ফরওয়ার্ড। বিভিন্ন পদ্ধতিতে গোলকিপার হিসেবের বাইরে থাকে।

খ) উভয় অর্ধে ৩৫ মিনিট করে খেলা হবে। যে দল বেশি গোল করবে সে দল জয়ী হবে। টসের মাধ্যমে বিজয়ী দল কিক অফ নেবে । অপর দল যেকোনো সাইড নেবে। খেলা চলাকালীন গোলকিপার ছাড়া কেউ হাত দিয়ে বল ধরতে পারবে না। যখন যে দলের খেলোয়াড়ের কাছে বল থাকে তখন সে দল আক্রমণকারী ও বিপক্ষ দল রক্ষণকারী। মাঠে গোলপোস্টের সামনে গোল এরিয়া পেনাল্টি এরিয়া এবং পেনাল্টিস্পট থাকে। আক্রমণকারী দলের কারো ছোঁয়া লেগে গোল লাইন দিয়ে বল আউট হলে বল গোল এরিয়ার মধ্যে যেকোনো জায়গায় বসিয়ে গোলকিক করতে হয়। রক্ষণকারী দলের কারো হাতে বল লাগলে বা মারাত্মক ফাউল করলে (পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে) আক্রমণকারী দল পেনাল্টি পায়। পেনাল্টি কিকের সময় গোলকিপার এবং কিকার ছাড়া কেউ পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে থাকতে পারবে না।

গ) পার্শ্ব রেখা দিয়ে বল মাঠের বাইরে গেলে থ্রো– ইনের মাধ্যমে খেলা আরম্ভ হয়। থ্রো মাথার উপর দিয়ে দুই হাতে সমান ভর দিয়ে থ্রো করতে হয়। রক্ষণকারী দলের ছোঁয়া লেগে বল গোল লাইন অতিক্রম করলে আক্রমণকারী দল কর্নার কিক পায়, কর্নার কিক মাঠের কোনা থেকে মারতে হয়। তা ছাড়া খেলা চলাকালীন যে দল যেখানে ফাউল করবে, বল সেখানে বসিয়ে বিপক্ষ দল কিক করবে।

ঘ) বল উপর দিয়ে পাঠাতে হলে বলের তলায় পায়ের বুড়ো আঙুলের উপরের অংশ দিয়ে মারতে হবে। বল আয়ত্তে আনা এবং ঠিকমতো সহযোগীকে পাস দেয়া ভালোভাবে আয়ত্ত করতে হবে। বল বিভিন্নভাবে আয়ত্তে আনা যায়– যেমন পায়ের পাতা দিয়ে, উরু দিয়ে, বুক দিয়ে ও মাথা দিয়ে। উঁচু বল মাথা দিয়েও পাস দেয়া যায়। একে হেড করা বলে। মনে রাখতে হবে, হেড করার সময় কপালের চ্যাপটা অংশ দিয়ে হেড করতে হবে।

ঙ) গোলকিপার হাত দিয়ে বল ধরতে পারে। সে পায়ের সাহায্যে বা হাত দিয়ে ছুড়ে সহযোগীকে পাস দেবে। যে বল গোলকিপার ধরতে অসুবিধা মনে করবে, সে বল সে ঘুষি মেরে সরিয়ে দেবে। মনে রাখতে হবে– গোলকিপারের হাতে বল থাকা অবস্থায় কেউ বলে লাথি মারতে পারবে না। যদি কেউ মারে বা মারার চেষ্টা করে তবে তার বিরুদ্ধে ফাউল হবে।

চ) খেলাচলাকালীন নিম্নলিখিত কাজগুলো ফাউল বলে গণ্য হবে। প্রতিপক্ষকে ল্যাং মারা, ধাক্কা দেয়া, ধরে রাখা, আঘাত করা, পেছন থেকে চার্জ করা, লাথি মারা এবং প্রতিপক্ষের উপর লাফিয়ে পড়া, মারাত্মকভাবে চার্জ করা, বিপজ্জনকভাবে খেলা, গালি দেয়া, থুথু দেয়া ইত্যাদি।

ছ) গোল এরিয়া উভয় পোস্ট হতে ৬ গজ, মাঠের দিকে ৬ গজ। পেনাল্টি এরিয়া উভয় পোল পোস্ট হতে ১৮ গজ,

এবং মাঠের দিকে ১৮ গজ। কর্নার কিক এরিয়া ১ গজ। মধ্য মাঠে কিক অফ করার বৃত্ত কেন্দ্রবিন্দু হতে ১০ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে বৃত্ত আঁকতে হয়।

শিখন শেখানো কার্যাবলি : শিক্ষার্থীদের ফুটবল খেলার নিয়মাবলি ও কৌশল মাঠে নিয়ে দেখিয়ে দেবেন, ভুল হলে সংশোধন করবেন। বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পেরেছে কি না তা জেনে নেবেন। দলে দলে ভাগ হয়ে অনুশীলন করায়ে পারদর্শিতা অর্জন করাবেন।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা দুই বা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে ফুটবল খেলার নিয়মাবলি ও কৌশল লিখে বোর্ডে উপস্থাপন করবে। মাঠে গিয়ে ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণ করবে। সবাই যেন খেলতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে ভালো ফুটবল খেলোয়াড় হওয়া যায়।

মূল্যায়ন :

ক. ফুটবল কতজন খেলে?

খ. কমপক্ষে কতজন হলে ফুটবল খেলা যায়?

গ. গোলকিক কখন হয় ?

ঘ. কী কী কাজ করলে ফাউল হয়?

ঙ. হেড করতে হলে মাথার কোন অংশ ব্যবহার করতে হয়?

পাঠ – ০৬ : ব্যাডমিন্টন

শিখনফল :

২.৩.১ ব্যাডমিন্টন খেলায় অংশগ্রহণ করবে।

উপকরণ : খেলার মাঠ, দুইটি খুঁটি, জাল, র‍্যাকেট, শাটল

বিষয়বস্তু : এ খেলার উৎপত্তি ভারতে। ১৮৭০ সালে ইংরেজরা মুম্বাইয়ের পুনা নামক স্থানে এই খেলাটি খেলতে দেখেন। তখন এটা পুনা গেম নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে ইংরেজরা তাদের দেশে এ খেলাটি নিয়ে যায়। ইংল্যান্ডের ব্যাডমিন্টন নামক জায়গায় এই খেলা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ঐ জায়গার নামানুসারে এ খেলা ব্যাডমিন্টন নামে প্রচলিত হয়। ১৮৯৫ সালে ইংল্যান্ডে ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। আমাদের দেশে শহর কিংবা গ্রাম সর্বত্রই শীতকালে এই খেলাটি হয়ে থাকে।

সাধারণ নিয়মাবলি :

১. খেলার মাঠ– ব্যাডমিন্টন দ্বৈত খেলার মাঠের দৈর্ঘ্য ১৩.৪০ মিটার (৪৪ ফুট) ও প্রস্থ ৬.১০ মিটার (২০ ফুট) একক খেলায় মাঠের দৈর্ঘ্য একই থাকে। কেবল প্রস্থে দুই পাশ থেকে ৭২ সেন্টিমিটার (১৮ ইঞ্চি) করে কমে গিয়ে ৫.১৮ মিটার (১৭ ফুট) হয়।

২. নেটের উচ্চতা মধ্যখানে ১.৫০ মিটার বা (৫ ফুট) এবং পোস্টের দিকে ১.৫৪ মিটার (৫ ফুট ১ ইঞ্চি), থাকে।

৩. একক ও দ্বৈত উভয় খেলায় ২১ পয়েন্টে গেম হয়। উভয় খেলোয়াড় বা দল ২০–২০ পয়েন্ট অর্জন করলে ডিউস হয়। সে ক্ষেত্রে ২ পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে থেকে জয়লাভ করতে হবে, অর্থাৎ ২২–২০, ২৫–২৩ ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে, এভাবে সর্বোচ্চ ৩০ পয়েন্টের মধ্যে অবশ্যই গেম শেষ করতে হবে। তিনটি গেমের মধ্যে যে বা যে দল দুই খেলায় জিতবে সে বা সে দল বিজয়ী হবে।

৪. খেলা পরিচালনার জন্য ১ জন রেফারি, ১ জন আম্পায়ার, ১ জন স্কোরার, ২/৪ জন লাইন জাজ থাকবেন।

৫. টস বিজয়ী সার্ভিস কিংবা সাইড পছন্দ করবে।

৬. একক খেলার সময় সার্ভিসকারীর পয়েন্ট শূন্য বা জোড় সংখ্যা হলে খেলোয়াড় তাদের ডান দিকের কোর্ট থেকে সার্ভিস করবে এবং বিজোড় সংখ্যা হলে বাম দিকের কোর্ট থেকে সার্ভিস করবে। প্রতি পয়েন্টের পর খেলোয়াড়রা তাদের সার্ভিস বা রিসিভ কোর্ট বদল করবে।

৭. দ্বৈত খেলার সময় প্রথম সার্ভিসের জন্য ডান দিকের খেলোয়াড় কোনাকোনি বিপক্ষের কোর্টে সার্ভিস করবে। যাকে সার্ভিস করা হবে কেবল সেই খেলোয়াড় সার্ভিস রিসিভ করবে। কোনো খেলোয়াড় পর পর দুই বার সার্ভিস করতে পারবে না। প্রথম গেমে বিজয়ী খেলোয়াড় দ্বিতীয় গেমে সার্ভিস শুরু করবে।

৮. সার্ভিসের সময় সার্ভারের দুই পা মাটি স্পর্শ করে থাকবে।

৯. সার্ভিস করার সময় শাটল কর্ক নেটে লেগেও যদি ঠিক কোর্টে পড়ে তবে, সার্ভিস ঠিক হয়েছে বলে ধরা হবে।

১০. সার্ভিসের সময় সার্ভার ও রিসিভকারীর পা তার কোর্টে রাখতে হবে। এ সময় কোনো রকম ভান করা চলবে না।

১১. শাটল কর্ক দাগ স্পর্শ করলেও শুদ্ধ হয়েছে বলে ধরা হবে।

১২. নেট অতিক্রম করে কেউ শাটল কর্ক মারতে পারবে না এবং খেলা চলাকালে কেউ র‍্যাকেট বা শরীরের কোনো অংশ দিয়ে নেট ও পোস্ট স্পর্শ করতে পারবে না।

খেলার মৌলিক কলাকৌশল হলো–

১. র‍্যাকেট ধরা **(Grip)**

২. সার্ভিস **(Service)**

৩. ফোর হ্যান্ড স্ট্রোক **(Fore hand stroke)**

৪. ব্যাকহ্যান্ড স্ট্রোক **(Back hand stroke)**

৫. মাথার উপর দিয়ে মারা **(Over hand stroke)**

১. র‍্যাকেট ধরা: র‍্যাকেট সঠিকভাবে ধরার ওপরই ব্যাডমিন্টন খেলা অনেকটা নির্ভর করে। কাজেই সঠিকভাবে র‍্যাকেট ধরা শেখার জন্য মনে রাখতে হবে যে, বাম হাতে র‍্যাকেটের মাথা ধরে খাড়াভাবে মাটিতে রেখে ধরে রাখবে। এবার ডান হাতের তালু উপুড় করে গ্রিপের শেষ প্রান্তে রেখে বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী সামনের দিকে প্রসারিত করে ইংরেজি বর্ণ V এর মতো করে গ্রিপ ধরবে। ভালো গ্রিপ ধরা আয়ত্তে আসলে ভালো খেলতে সাহায্য করে।

২. সার্ভিস: একজন খেলোয়াড় নিয়মকানুন মেনে খেলার শুরুতে এবং প্রতি পয়েন্টের শুরুতে প্রতিপক্ষের কোর্টে শাটল কর্ক পাঠানোকে সার্ভিস বলে। এই সার্ভিসের মাধ্যমে শাটল খেলার মধ্যে আনা হয়। সার্ভিসটি বিপক্ষ কোর্টের এমন জায়গায় পাঠাতে হবে, যাতে বিপক্ষ খেলোয়াড়দের ফেরত পাঠাতে অসুবিধা হয়। সার্ভিস করার সময় পা ফাঁক করে বাম পা ডান পায়ের কিছুটা সামনে নিয়ে দাঁড়াবে। শরীরের ওজন পেছনের পায়ের উপর থাকবে। বাম হাতে শাটল কর্ক ধরে, ডান হাতের র‍্যাকেটকে পেছনের দিক থেকে আনার মুহূর্তে শাটল কর্ক ছেড়ে দিয়ে কোমরের নিচে থেকে আঘাত করে বিপক্ষ কোর্টে পাঠাবে। শাটল কর্ক ও র‍্যাকেটের সংযোগের সাথে সাথে দেহের ওজন বাম পায়ের উপর চলে আসবে। সার্ভিস দুই প্রকার—শর্ট সার্ভিস ও লং সার্ভিস। শর্ট সার্ভিসে নেটের কাছাকাছি বিপক্ষের সার্ভিস কোর্টে শাটল কর্ক পাঠানো হয় এবং লং সার্ভিসে কোর্টের পেছনের অংশে পাঠানো হয়।

৩. ফোর হ্যান্ড স্ট্রোক: হাতের তালুকে সামনে রেখে ডানহাতি খেলোয়াড় ডান দিকে এবং বাম হাতি খেলোয়াড় বাম দিকে শাটল কর্ক মারলে তাকে ফোর হ্যান্ড স্ট্রোক বলে। সঠিকভাবে র‍্যাকেট ধরে বাম কাঁধকে নেটের দিকে করে বাম পাকে সামনে রেখে দাঁড়াতে হবে। শাটল কর্কের পেছনে এসে র‍্যাকেটটাকে কাঁধের পেছনে নিয়ে শাটল কর্ককে আঘাত করবে।

৪. ব্যাক হ্যান্ড স্ট্রোক : সঠিকভাবে র‍্যাকেট ধরে হাতের তালু পেছনের দিকে করে ডান কাঁধ নেটের দিকে দিয়ে শাটল কর্ক মারলে তাকে ব্যাক হ্যান্ড স্ট্রোক বলে।

৫. মাথার উপর দিয়ে মারা : সাধারণত স্ম্যাশ বা চাপ মারার কাজে এই স্ট্রোক ব্যবহার করা হয়। এই স্ট্রোক ফোর হ্যান্ড ও ব্যাক হ্যান্ড দুটোই ব্যবহার করা যেতে পারে। শাটল কর্কের নিচে এসে র‍্যাকেট উঁচু করে লাফ দিয়ে যতটুকু উঁচুতে সম্ভব শাটল কর্ককে আঘাত করবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ব্যাডমিন্টন খেলার নিয়মাবলি ও বিভিন্ন কলা কৌশল সম্পর্কে ধারণা দেবেন। তারা সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছে কি না, তা বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জেনে নেবেন। খেলাধুলায় উৎসাহী ও পারদর্শী এমন দুজনকে দিয়ে কীভাবে খেলতে হয় তা প্রদর্শন করাবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের ব্যাডমিন্টন খেলতে বলবেন। সঠিক নিয়মে খেলতে পারছে কিনা তা লক্ষ করবেন।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে ব্যাডমিন্টন খেলায় অংশগ্রহণ করবে। সবাই যেন পর্যায়ক্রমে খেলতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। ব্যাডমিন্টনের কৌশলগুলো বোর্ডে লিখে দেখাবেন। নিয়মিত অনুশীলন করলে ভালো খেলোয়াড় হওয়া যায়।

মূল্যায়ন :

১. ব্যাডমিন্টন কোর্টের পরিমাপ ও নেটের উচ্চতা কত?

২. বিজয়ী কীভাবে নির্ধারিত হয়?

৩. দ্বৈত খেলার সার্ভিস পদ্ধতি বর্ণনা কর ।

৪. ফোর হ্যান্ড স্ট্রোকের কৌশল ব্যাখ্যা কর।

৫. মাথার উপর দিয়ে শাটল মারার কৌশল বর্ণনা কর ।

পাঠ – ০৭ : হ্যান্ডবল

শিখনফল :

২.৩.১ হ্যান্ডবল খেলায় অংশগ্রহণ করবে।

উপকরণ : খেলার মাঠ, গোলপোস্ট, নেট ও বল ।

বিষয়বস্তু : জার্মানিতে প্রথম হ্যান্ডবল খেলা শুরু হয় ১৮৯০ সালে। ১৯২৮ সালে ইন্টারন্যাশনাল অ্যামেচার

হ্যান্ডবল ফেডারেশন গঠন করা হয়। ১৯৭৪ সালে কুয়েতে প্রথম এশিয়ান হ্যান্ডবল ফেডারেশন গঠিত হয় । ১৯৭২ সালে হ্যান্ডবল প্রথম অলিম্পিকে অন্তর্ভুক্ত হয়। বাংলাদেশে হ্যান্ডবল খেলা শুরু হয় ১৯৮২ সালে। এই খেলা বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

সাধারণ নিয়মাবলি :

১. হ্যান্ডবল খেলার কোর্টটি ৪০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ২০ মিটার প্রস্থবিশিষ্ট একটি আয়তক্ষেত্র । বড় সীমারেখাদ্বয়কে পার্শ্বরেখা এবং ছোট সীমারেখাদ্বয়কে গোল লাইন বলে।

২. প্রতিটি গোলপোষ্ট লম্বায় ৩ মিটার। উচ্চতা ভূমি হতে ক্রস বারের নিচ পর্যন্ত ২ মিটার। গোলপোস্ট ও ক্রসবার ৮×৮ সেন্টিমিটার ব্যাসযুক্ত বর্গকার হতে হবে।

৩. গোলপোস্টের সম্মুখ বরাবর কোর্টের দিকে ৬ মিটার দূরে গোল লাইনের সমান্তরাল ৩ মিটার লম্বা একটি লাইন টানতে হবে। তারপর গোলপোস্টের সাইড বারের পেছনের দিকের ভেতরের কোনা হতে পূর্বে অঙ্কিত ৩ মিটার লাইনের উভয় প্রান্ত হতে ৬ মিটার ব্যাসার্ধের দুটি বৃত্তচাপ অঙ্কন করে গোল লাইনের সাথে যুক্ত করে গোলসীমা তৈরি করতে হবে। অঙ্কিত লাইনটিকে গোল এরিয়া লাইন বলে। কোর্টের সকল দাগ খেলার কোর্টের অংশ বলে বিবেচিত হবে। দুই গোলপোস্টের মাঝের গোল লাইন ৮ সেন্টিমিটার চওড়া হবে। এ ছাড়া কোর্টের অন্যান্য রেখা ৫ সেন্টিমিটার চওড়া হবে।

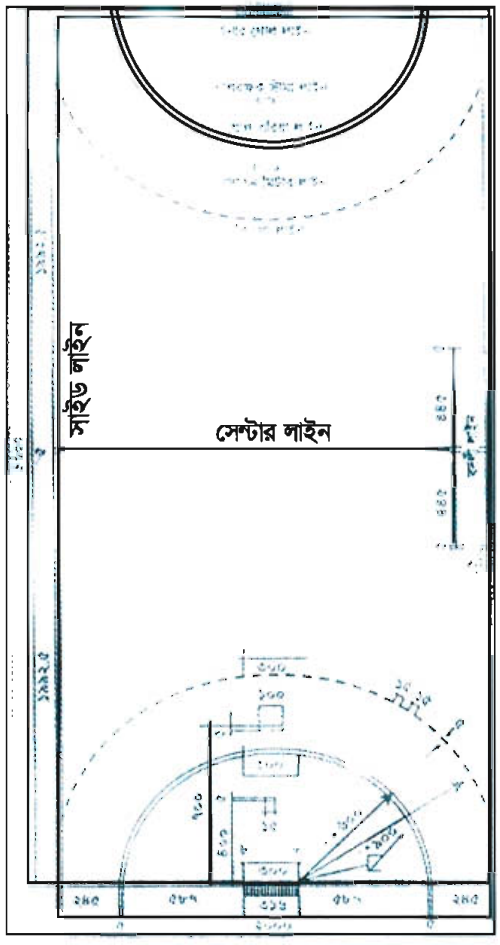

হ্যান্ডবল কোর্ট

৪. খেলার সময়সীমা হবে ২০+২০=৪০ মিনিট। ১০ মিনিট অর্ধবিরতি থাকবে।

৫. নির্ধারিত সময়ে খেলা ড্র থাকলে অতিরিক্ত ৫ মিনিট করে অর্থাৎ ৫+১+৫ মিনিট খেলা হবে। এরপরও যদি ড্র থাকে তাহলে আবার ৫+১+৫ মিনিট খেলা চলবে।

৬. বলের ওজন ২৯০–৩৩০ গ্রাম এবং পরিধি ৫০–৫২ সেন্টিমিটার।

৭. প্রতি দলে ১২ জন খেলোয়াড় থাকে। মাঠে খেলতে নামে ৭ জন। কমপক্ষে ৫ জন খেলোয়াড় না হলে হ্যান্ডবল খেলা হয় না।

৮. খেলা আরম্ভের সময় বা গোল হবার পর বা বিরতির পর 'থ্রো অফ' করে খেলা শুরু হবে।

৯. কোর্ট খেলোয়াড়রা বাহু, মাথা, দেহ, উরু দিয়ে বলকে ধরতে ও থামাতে বা আঘাত করতে পারবে। বলকে

৩ সেকেন্ডের বেশি ধরে রাখতে বা ৩ পদক্ষেপে বেশি এগোতে পারবে না। হাঁটুর নিচের অংশ দিয়ে বল স্পর্শ করলে শাস্তিস্বরূপ বিপক্ষ দল ফ্রি থ্রো পাবে।

১০. গোলরক্ষকের হাতে লেগে বা গোল লাইন দিয়ে বল মাঠের বাইরে গেলে গোল থ্রো এর মাধ্যমে খেলা শুরু হবে।

১১. বিপক্ষ দলকে ফ্রি থ্রো দেয়া হবে যদি–

ক. গোলরক্ষক নিয়ম ভঙ্গ করলে;

খ. ত্রুটিপূর্ণভাবে খেলোয়াড় বদলি করলে;

গ. কোর্ট খেলোয়াড় গোলসীমা আইন ভঙ্গ করলে;

ঘ. প্রতিপক্ষের প্রতি অবৈধ আচরণ করলে;

ঙ. ত্রুটিপূর্ণ থ্রো–ইন করলে;

চ. যেকোনো থ্রো করতে ভুল করলে;

ছ. ত্রুটিপূর্ণ থ্রো অফ করলে;

জ. অখেলোয়াড়সুলভ আচরণ করলে;

ঝ. গোলরক্ষক গোলসীমার বাইরের বল নিয়ে গোলসীমায় প্রবেশ করলে;

ঞ. গোলরক্ষকের কাছে গোলসীমায় ব্যাকপাস করলে।

১২. গোলরক্ষক তার গোল এরিয়ার মধ্যে শরীরের যেকোনো অংশ দিয়ে খেলতে পারবে।

১৩. বিপক্ষ সেভেন মিটার থ্রো পাবে যদি –

ক. মাঠের যেকোনো স্থানে কোনো খেলোয়াড় বা কর্মকর্তা আক্রমণকারী দলের একটি গোলের উজ্জ্বল সুযোগ অবৈধভাবে নষ্ট করে দিলে।

খ. একটি নিশ্চিত গোল করার সময় যদি কোনো অবৈধ বাঁশির সংকেতে তা নষ্ট হয়ে যায়।

গ. মাঠে প্রবেশের অনুমতি নেই-এমন কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর কারণে যদি একটি নিশ্চিত গোলের সুযোগ নষ্ট হয়।

১৪. বল পার্শ্বরেখা অতিক্রম করলে থ্রো ইনের মাধ্যমে খেলা শুরু হবে ।

১৫. সম্পূর্ণভাবে বলটি গোলের ভেতরের লাইন অতিক্রম করলে গোল হয়েছে বলে ধরা হবে। যে দল বেশি গোল করবে সেই দল বিজয়ী হবে।

১৬. খেলা পরিচালনার জন্য দুজন রেফারি, একজন সময় রক্ষক ও একজন স্কোরার থাকেন।

কলাকৌশল :

১. বল ধরা– হ্যান্ডবল খেলায় বলটাকে বিভিন্নভাবে ধরা যায়– সম্মুখের বল ধরা, নিচের বল ধরা, পাসের বল ধরা ও লাফিয়ে বল ধরা।

সম্মুখের বল ধরা : দণ্ডায়মান অবস্থায় সামনের দিকে দুটি হাত বাড়িয়ে হাঁটু ভেঙে অর্ধবৃত্তাকার একটি ফানেল তৈরি করতে হবে। বলটি ধরার সঙ্গে সঙ্গে বলসহ হাতটি বুকের দিকে টেনে আনতে হবে।

নিচের বল ধরা : কোমরের নিচের বল ধরার জন্য হাঁটু ভেঙে শরীরে উপরের অংশ সামনে বাঁকিয়ে দুই হাত সামনে প্রসারিত করে (দুই হাতের কনিষ্ঠাআঙুল একসাথে মিলিয়ে) বল ধরার পর বলসহ হাত বুকের দিকে টেনে তুলতে হবে।

২. বল পাস দেয়া –এক হাতে বল ছুড়ে পাস দেয়ার সময় বলটাকে সাধারণত ডান হাতে ধরে কাঁধের পেছনে হাতটাকে নিয়ে বাঁ পায়ের উপর শরীরের ভর রেখে ছুড়তে হয়। বাঁ হাতটাকে সামনে রেখে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়। বিভিন্নভাবে বল পাস করা যায়। যেমন– কাঁধ বরাবর, কবজি ঘুরিয়ে, হাত কোমরের নিচে এনে এবং মাথার উপর দিয়ে।

৩. গোলপোস্টে বল ছোঁড়া : হ্যান্ডবল খেলায় একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার বাইরে থেকে বল ছুড়ে গোল করতে হয়। বলকে বিভিন্নভাবে ছুড়ে গোল করা যায়। যেমন – সরাসরি ছুড়ে মারা, লাফিয়ে মারা, বলকে মাটিতে বাউন্স করে মারা ইত্যাদি।

বল কাটিয়ে নিয়ে যাওয়া : বল হাতে ধরে তিন কদমের বেশি নিয়ে যাওয়া যায় না। তাই আয়ত্তে রাখতে হলে বলকে অবশ্যই মাটিতে বাউন্স করতে হবে। এভাবে যতক্ষণ ইচ্ছা বলকে কাছে রাখা যায় এবং বল নিয়ে এগিয়ে যাওয়া যায়।

গোলপোস্টে বল ছোড়া

শিখন শেখানো কার্যাবলি : শিক্ষার্থীদের সামনে শিক্ষক হ্যান্ডবল খেলার নিয়মাবলি এবং কলাকৌশল বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে মাঠে নিয়ে অনুশীলন করাবেন। সঠিকভাবে তারা শিখতে পেরেছে কি না তা বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নিশ্চিত হবেন। শিক্ষার্থীদের জানায় অস্পষ্টতা থাকলে পুনরায় আলোচনা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে হ্যান্ডবল খেলায় অংশগ্রহণ করবে। প্রয়োজনে সময় কমিয়ে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। কোনো সমস্যা দেখা দিলে নিজেরা সমাধান করার চেষ্টা করবে।

অনুশীলনের মাধ্যমে ভালো হ্যান্ডবল খেলোয়াড় হওয়া যায়।

মূল্যায়ন:

১. হ্যান্ডবল কোর্টের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কত?

২. কী কী কারণে ফ্রি থ্রো দেয়া হয়?

৩. হ্যান্ডবল খেলা কীভাবে শুরু হয়?

৪. কী কী কারণে সেভেন মিটার থ্রো দেয়া হয়?

৫. হ্যান্ডবল ধরার কৌশল বর্ণনা কর ।

৬. কীভাবে বল ছোড়া যায়?

তৃতীয় অধ্যায়
ছন্দময় ব্যায়াম ও নাচ

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

৩.১ ছড়াগানের তালে তালে ও বিভিন্ন নাচের মাধ্যমে আনন্দ লাভ, আঞ্চলিক কৃষ্টি সম্বন্ধে ধারণা ও নাচের কলাকৌশল আয়ত্ত করতে পারবে।

৩.২ ছড়াগানের তালে তালে পিটি ও ব্যায়ামের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমন্বয় সাধন এবং আনন্দ লাভ করবে।

শিখনফল :

৩.১.১ ছড়াগানের (ব্রতচারী অনুযায়ী) তালে তালে বিভিন্ন প্রকার নাচের অনুশীলন করতে পারবে।

৩.২.১ ছড়াগানের তালে তালে পিটি ও ব্যায়ামের অনুশীলন করবে।

পাঠ বিভাজন–০২

পাঠ–০১ : ছড়াগানের মাধ্যমে নাচ।

শিখনফল :

৩.১.১ ছড়াগানের তালে তালে বিভিন্ন প্রকার নাচের অনুশীলন করতে পারবে।

উপকরণ : খোলা জায়গা/মাঠ/জিমনেসিয়াম ও বাঁশি

বিষয়বস্তু : ছড়াগান শুধু শিক্ষার্থীদের মনোরঞ্জনের জন্যই নয়। এর মধ্য দিয়েই সে চিত্তবৃত্তির বিকাশ ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে। সেই সাথে আনতে পারে তার শারীরিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও কুশলতা প্রয়োগের সুযোগ। বিভিন্ন রকমের ছড়ার ব্যায়ামের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর শুধু শারীরিক বিকাশই ঘটে না, এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর কল্পনা ও অনুকরণ প্রবণতাও গড়ে ওঠে। ছড়ার মাধ্যমে ব্যায়ামের প্রতিটি ছড়ার অর্থ বা বক্তব্য অনুযায়ী শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়ানো ও দোলাতে হয়। ছড়া ব্যায়াম করার সময় দুটি কথা মনে রাখতে হবে।

১। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে উপযুক্ত ও সঠিকভাবে সঞ্চালন করা।

২। সকলে মিলে একসাথে ছড়াগুলো বলা।

এ দুটোর প্রতি লক্ষ রেখে যদি সঠিকভাবে অনুশীলন করানো যায় তাহলে ছড়ার ছলে ব্যায়াম সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠবে। নিম্নে দু-একটি ছড়ার নমুনা দেয়া হলো–

১। এক যে ছিল শেয়াল
তার চাপল রাতে খেয়াল।।
তাক করে সে তালটি ঠুকে
টপকে গেল দেয়াল।।
ঢুকল রাজার ঘরে।
ভয়েই রাজা মরে।।
ঠক ঠকিয়ে কাঁপতে থাকে
তকতো পোষের পরে।।
শেয়াল বলে রাজা।
আমি মাংস খাব ভাজা।।
মণ্ডা খাব, মিঠাই খাব।
খাব পাঁপড় ভাজা।।
মারল আবার চড়
রাজার গালের পরে
শব্দ শুনে দৌড়ে আসে।
সাতশ রাজার চর।
শেয়াল ভেবে মরে
ঢুকল কেন ঘরে।
মন্ত্রী এসে খপাত করে
লেজটা টেনে ধরে।

২। গাছ বাড়ছে পলে পলে
বাড়ছে ধানের শিষটা
নেচে নেচে চলছে চাষি
নাচছে তাদের মনটা।

৩। কুড়ালখানা তুলে ধরো হাইয়ো।
কাঠের উপর কুড়াল মারো হাইয়া।।
আবার তোলো কুড়ালখানা হাইয়ো।
চেরাই হবে গুঁড়িখানা হাইয়ো।।
টুকরাগুলো গুছিয়ে রাখো হাইয়ো।
ফাঁসের দড়ি জোরসে টানো হাইয়ো।।
হ্যাঁচকা টানে মাথায় তোলো হাইয়ো।।

৪। কাইয়ে ধান খাইলে রে
খেদানের মানুষ নাই;
খাওয়ার বেলায় আছে মানুষ
কামের বেলায় নাই
কাইয়ে ধান খাইল রে

উপরিউক্ত ছড়া গানের তালে তালে অঙ্গাভঙ্গি ও নাচ ছাড়াও নৃত্য করা যায়। নিচে একটি নৃত্যের নমুনা দেয়া হলো–

মোরা ছুটব মোরা খেলব বসে কুঁড়ে হয়ে থাকব না।
ছাতি ফাটাবে মাথা ভাঙাবে তবু পরাজয় মানব না।
মোরা নাচব মোরা গাইব মিছে মিছে শরবতে জড়ব না
গুরু-ছাত্র , পুঁথি মাত্র, পড়ে অকালেতে মরব না।

১ম সংকেতে– দু/তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে দলের শিক্ষার্থীরা একে অপরের হাত ধরাধরি করে একটি বৃত্ত রচনা করবে। (সকলের মুখ বৃত্তের ভেতরের দিকে থাকবে)।

২য় সংকেতে– ডান দিকে ঘুরে বৃত্তের চারদিকে দৌড়াতে থাকবে।

৩য় সংকেতে– দৌড়ানো অবস্থায় যথাক্রমে দুই হাত পাশে, সামনে ও উপরে তুলবে।

৪র্থ সংকেতে– থেমে যাবে ও দুই পায়ের পাতার উপর ভর করে বসে দুই হাত সামনে আড়াআড়িভাবে দোলাবে।

৫ম সংকেতে– হাত দোলানো বন্ধ করে দুই হাত বুকের কাছে আনবে ও প্রসারিত করবে এবং এদিক সেদিক মাথা হেলাতে থাকবে।

৬ষ্ঠ সংকেতে– থেমে যাবে ও দুই হাত আড়াআড়িভাবে দোলাবে।

৭ম সংকেতে– হাত দোলানো বন্ধ করে দাঁড়াবে এবং বাম দিকে ঘুরে বৃত্তের ভেতরের দিকে মুখ করে দাঁড়াবে।

৮ম সংকেতে– সারিবদ্ধভাবে ক্লাসে ফিরে যাবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ছড়াগানের তালে তালে কীভাবে অঙ্গাভঙ্গি করতে হয় তার স্পষ্ট ধারণা দেবেন। ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে নির্ভুল ভঙ্গিমায় অঙ্গা সঞ্চালনের কৌশলগুলো আয়ত্ত করাবেন। যাতে শিক্ষার্থীরা সহজেই আয়ত্ত করতে পারে। শিক্ষক নিজে করে দেখাতে পারলে ভালো হয়, তা না হলে যেসব শিক্ষার্থী নির্ভুলভাবে করতে পারছে তাদের সামনে এনে নমুনা প্রদর্শন করবেন। সংকেতের সাহায্যে কীভাবে নৃত্য করে আনন্দ লাভ করা যায় তারও বর্ণনা দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা ছড়াগান ও সংকেতের সাথে নির্ভুল ভঙ্গিমায় অঙ্গাভঙ্গি ও নৃত্য করবে এবং দলে দলে বারবার অনুশীলন করবে। যাদের ভুল হচ্ছে তারা অতিরিক্ত সময় নিয়ে অনুশীলন করবে। এভাবে অনুশীলন করলে পারদর্শী হওয়া যায়।

মূল্যায়ন :

১। ছড়াগানের মাধ্যমে কীভাবে অঙ্গাভঙ্গি করা যায়? ব্যাখ্যা কর।

২। একটি ছড়াগান মুখস্থ বল?

৩। সংকেতের সাহায্যে কীভাবে অঙ্গাভঙ্গি করবে তা করে দেখাও?

পাঠ–০২ : নাচের তালে তালে পিটি ও ব্যায়াম।

শিখনফল :

৩.২.১ ছড়াগানের তালে তালে পিটি ও ব্যায়াম অনুশীলন করবে।

উপকরণ : খোলা জায়গা/মাঠ/জিমনেসিয়াম ও বাঁশি।

বিষয়বস্তু : শিক্ষার্থীরা সাধারণত দলগতভাবে ছড়াগানের সাথে সাথে বিভিন্ন প্রকার অঙ্গাভঙ্গি করতে ভালোবাসে। ছড়াগানের তালে তালে পিটি ও ব্যায়াম করলে শিক্ষার্থীদের চলাফেরা, কথাবার্তার মধ্য দিয়ে চটপটে ভাব ফুটে উঠবে। নিচে কয়েকটি কবিতার লাইন উদ্ধৃত করা হলো। এই কবিতা আবৃত্তির তালে তালে শিক্ষার্থীরা হাত দুলিয়ে বুক ফুলিয়ে চলবে এবং প্রচুর আনন্দ লাভ করবে।

ক) চল্– চল্– চল্
উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী তল
অরুণ পাতের তরুণ দল
চলরে–চলরে–চল।

খ) খেলার সময় হলো ভাই
চল সবে মাঠে যাই
দৌড়ে দৌড়ে খেলা করি
নাচি আর গান করি
হে–ই–ও বলে দেই টান
এবার সবে চল যাই
আবার উঠে গাই গান।

গ) থাকব নাকো বন্ধ ঘরে
দেখব এবার জগৎটাকে

কেমন করে ঘুরছে মানুষ
যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
দেশ হতে দেশ দেশান্তরে
ছুটছে তারা কেমন করে,
কিসের নেশায় কেমন করে
মরছে বীর লাখে লাখে।
পাতাল ফেড়ে নামব আমি
উঠব আমি আকাশ ফুঁড়ে
বিশ্বজগৎ দেখব আমি
আপন হাতের মুঠোয় পুরে।

সংকেতের তালে তালে পিটি ও ব্যায়াম :

ক) সূচনামূলক ব্যায়াম

প্রথম সংকেতে– দুই হাত কোমরে রেখে হাঁটু উঁচু করে লাফাবে।

দ্বিতীয় সংকেতে– দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে দুই হাত মাথার উপরে তুলবে ও পাশে নামাবে।

তৃতীয় সংকেতে– দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে দুই হাত সামনে ও পাশে প্রসারিত করবে। দুই হাত উপরে উঠাবে ও শরীরের পাশে আনবে।

চতুর্থ সংকেতে– দুই হাত কোমরে রেখে লাফসহকারে দুই পা ফাঁক করবে ও একত্রে আনবে।

পঞ্চম সংকেতে– দুই হাত কোমরে রেখে তালে তালে একবার বাম পা পাশে উঠাবে ও একবার ডান পা পাশে উঠাবে। এভাবে চলতে থাকবে।

খ) হাত ও কাঁধের ব্যায়াম:

প্রথম সংকেতে– দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে দুই হাত সামনে পাশে প্রসারিত করবে এবং উপরে-নিচে হাততালি দেবে।

দ্বিতীয় সংকেতে– দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে দুই বাহু একসাথে পর্যায়ক্রমে ডানে-বামে ঘুরাবে।

তৃতীয় সংকেতে– দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে দুই হাতকে সামনে, পাশে, উপরে-নিচে আনা-নেয়া করবে।

চতুর্থ সংকেতে– দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে একবার ডান হাত, একবার বাম হাত ও পরে দুই হাত একসাথে ঘোরাবে। এভাবে চলতে থাকবে।

গ) পায়ের ব্যায়াম

প্রথম সংকেতে– দুই হাত কোমরে রেখে লাফসহকারে দুই পা ফাঁক করবে আবার একত্র করবে।

দ্বিতীয় সংকেতে– একই অবস্থান থেকে পর্যায়ক্রমে ডান-বাম পা সামনে পেছনে আনা নেয়া করবে।

তৃতীয় সংকেতে– হাঁটু উঁচু করে একই জায়গায় দৌড়াবে।

চতুর্থ সংকেতে– কোমরে দুই হাত রেখে তিনটি ছোট ছোট লাফ ও চতুর্থবারে অর্ধ বসার ন্যায় বসবে। আবার সোজা হবে।

পঞ্চম সংকেতে– দুই হাত কোমরে রেখে ডান পা ডান পাশে ও বাম পা বাম পাশে উঠানামা করবে।

ষষ্ঠ সংকেতে– এক পায়ের পাতার উপর ভর করে লাফাবে। পরে পা বদল করে লাফাবে। এভাবে চলতে থাকবে।

ঘ) সমন্বিত ব্যায়াম

প্রথম সংকেতে– লাফ সহ দুই পা ফাঁক ও দুই হাত একসাথে পাশে প্রসারিত করবে ও একত্র করবে।
দ্বিতীয় সংকেতে– এক হাঁটু ও তার বিপরীত বাহু উঁচুতে তুলে লাফাবে।
তৃতীয় সংকেতে– দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে দুই হাত একসাথে ডান ও বাম পাশে ঘোরাবে।
চতুর্থ সংকেতে– দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে দুই হাত মাথার উপর একসাথে নিয়ে ডানে-বামে দেহ বাঁকাবে।
পঞ্চম সংকেতে– একই স্থানে মার্চের ভঙ্গিতে দ্রুত বাম ও ডান পা ওঠানামা করবে। এভাবে চলতে থাকবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ছড়া গান ও সংকেতের তালে তালে পিটি ও ব্যায়াম অনুশীলন করাবেন। ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে ছন্দের ও সংকেতের প্রতিটি স্টেপের বর্ণনা দিয়ে– শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন , যাতে শিক্ষার্থীরা সহজেই ছন্দের অঙ্গাভঙ্গি ও সংকেতের ব্যায়াম সম্পর্কে বুঝতে পারে। পিটি ও ব্যায়াম প্রদর্শন এসব কিছুই নির্ভর করে শিক্ষকের নির্দেশ প্রদান ও দক্ষতার উপর। কোন ছন্দের সাথে বা সংকেতের সাথে শরীরের কোন অংশের ব্যায়াম করবে তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জেনে নেবেন যে শিক্ষার্থীরা কতটুকু শিখেছে। শিক্ষার্থীরা ছড়াগান ও সংকেতের তালে তালে পিটি ও ব্যায়াম করে দেখাবে। ভুল হলে সংশোধন করে দেবেন। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে শিক্ষার্থীরা সঠিক অঙ্গাভঙ্গি ও ব্যায়ামগুলো অনুশীলন করবে। বারবার অনুশীলন করলে সহজেই আয়ত্ত করতে পারবে।

মূল্যায়ন :

১। পিটি বা ব্যায়াম কাকে বলে?
২। সংকেতের সাহায্যে ব্যায়াম করে দেখাও।
৩। সমন্বিত ব্যায়াম করে দেখাও।

চতুর্থ অধ্যায়

শৃঙ্খলা ও নেতৃত্ব

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

৪.১ নেতৃত্বদানের গুণাবলি অর্জন করতে পারবে।

৪.২ খেলাধুলার সরঞ্জামাদি যত্নের সাথে ব্যবহার করা শিখবে এবং পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন করে সংরক্ষণ করবে।

শিখনফল :

৪.১.১ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন ও পরিচালনার অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

৪.১.২ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন করতে পারবে।

৪.২.১ খেলাধুলার সরঞ্জামাদি পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন রাখতে পারবে।

৪.২.২ খেলাধুলার সরঞ্জামাদি যত্নসহকারে সংরক্ষণ করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন–০২

পাঠ–০১ : বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালনার মাধ্যমে নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন।

শিখনফল :

৪.১.১ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন ও পরিচালনার অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

৪.১.২ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন করতে পারবে।

উপকরণ : শ্রেণিকক্ষ/খেলার মাঠ।

বিষয়বস্তু : ব্যক্তিগত এবং সমাজ জীবনে, রাষ্ট্র গঠনে ও নেতৃত্বদানের যোগ্যতা অর্জনের জন্য খেলাধুলার আয়োজন ছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালনা সহায়তা ও যোগদানের মধ্য দিয়েই নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন করা যায়। যেমন–

ক) বার্ষিক ক্রীড়া : ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনার সময় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে দিলে শিক্ষার্থীরা তা আনন্দের সাথে পালন করে। এতে করে তাদের দায়িত্ববোধ জাগ্রত হবে, নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জিত হবে।

খ) মিলাদ মাহফিল : আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা এবং বিশ্বাস স্থাপনের জন্য বাড়িতে ,বিদ্যালয়ে বা অন্য স্থানে মিলাদ মাহফিলে যোগদানের নির্দেশ দিতে হবে। এসব মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে আল্লাহ ও রসুল সম্পর্কে জানবে এবং তাঁর আদর্শ মেনে চলার চেষ্টা করবে। কাজের প্রেরণা আসে নিজের ইমান ও বিশ্বাস থেকে। আর এ বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে সুন্দর সমাজ গঠিত হয়।

গ) পুরস্কার বিতরণী : বছর শেষে কোনো এক নির্দিষ্ট দিনে খেলাধুলা, কবিতা, গান, পরিষ্কার –পরিচ্ছন্নতা, ক্লাসে উপস্থিতি প্রভৃতি বিষয়ে পুরস্কার প্রদান করা ছাড়াও বিশেষ দিবস যেমন– বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস ও অন্যান্য বিশেষ দিনগুলোতে প্রতিযোগিতার আয়োজন করে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। দায়িত্বগুলো শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে করাতে হবে। এতে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব , দলনেতার নির্দেশ মেনে চলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে ও ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার দক্ষতা অর্জন করবে। শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলা জ্ঞান বাড়ানো, শিক্ষকের নির্দেশ শোনা, উপদেশ পালনে অভ্যস্ত করা, জাতীয়তাবোধ, একাত্ববোধ বৃদ্ধি করা এবং নেতৃত্বদানের গুণগুলো আয়ত্ত করার জন্য প্রতিদিন ক্লাস শুরুর আগে ছাত্রশিক্ষক মিলে সমাবেশ হওয়া দরকার। শ্রেণিকক্ষে দলনেতা নির্বাচন করে নেতৃত্ব ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধির জন্য দায়িত্ব বন্টন করে দিতে হবে। খেলাধুলার ক্লাসে বা অন্য কোনো কাজে শিক্ষার্থীরা যাতে স্বার্থপরতা না দেখায় তাদের দায়িত্ববোধ ও দলীয় মনোভাব গড়ে তোলার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে একে অন্যকে সাহায্য

করার প্রবণতা গড়ে ওঠে। খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে। সহপাঠী ও সমবয়সীদের সাথে খেলাধুলা করলে সামাজিক মনোভাব গড়ে উঠে এবং অপরের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে শেখে। শিক্ষার্থীদের সৎ ও যোগ্য নাগরিক হয়ে গড়ে উঠার জন্য উপদেশ দিতে হবে। বিদ্যালয় ও খেলার মাঠের নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলার অভ্যাস গঠনের উপদেশ দিলে শিক্ষার্থীরা সেভাবেই গড়ে উঠবে। এভাবে খেলাধুলার নানাবিধ আইনকানুন অনুসরণ করলে শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলতে অভ্যস্ত হয় এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয়। কথায় ও ব্যবহারে কাউকে কষ্ট না দেয়া এবং খেলার মাঠে সব সময় খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব পোষণের পরামর্শ দিতে হবে। এসবের মধ্য দিয়েই নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জিত হবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি : নেতৃত্ব প্রদান করতে হলে কী কী গুণাবলি অর্জন করতে হবে তা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন। যেমন– সততা, নেতার প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য, সহনশীলতা ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া ইত্যাদি। শিক্ষক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করবেন যে শিক্ষার্থীরা এই গুণাবলি অর্জন করতে পারছে কি না। সহপাঠী ও সমবয়সীদের সাথে খেলাধুলা করলে সামাজিক মনোভাব গড়ে উঠে এবং অপরের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে শেখে। খেলাধুলার মাধ্যমে একে অপরকে ভালোভাবে বুঝতে পারবে এবং দলীয় চেতনা, সহানুভূতি ও সহনশীলতা গড়ে উঠবে। খেলার মাঠে, বিদ্যালয়ে ও বাড়িতে পরস্পরের প্রতি সহনশীল ও ধৈর্যশীল হয়ে থাকার উপদেশ দিলে সে মোতাবেক শিক্ষার্থীরা নিজেকে তৈরি করতে শিখবে। শিক্ষকই হচ্ছেন শিক্ষার্থীদের প্রেরণার মূল উৎস।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা শিক্ষক কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে। এর মধ্য দিয়েই নেতৃত্বগুণ বৃদ্ধি পাবে। এভাবেই আস্তে আস্তে নেতৃত্বের গুণাবলি আয়ত্ত করতে পারবে এবং প্রদর্শন করে দেখাতে পারবে।

মূল্যায়ন :

১। নেতৃত্ব দানের গুণাবলি কীভাবে অর্জিত হবে?

২। দলনেতার কাজ কী?

৩। ধৈর্য ও সহনশীলতা কীভাবে অর্জিত হবে?

পাঠ–০২ : খেলাধুলার সরঞ্জামাদির যত্ন ও সংরক্ষণ।

শিখনফল :

৪.২.১ খেলাধুলার সরঞ্জামাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

৪.২.২ খেলাধুলার সরঞ্জামাদি যত্ন-সহকারে সংরক্ষণ করতে পারবে।

উপকরণ : শ্রেণিকক্ষ/খেলার মাঠ ও খেলাধুলার সরঞ্জামাদি।

বিষয়বস্তু : খেলাধুলার সরঞ্জামাদি মাঠে আনা–নেয়া ও খেলাশেষে যথাস্থানে রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শিক্ষক লক্ষ করবেন শিক্ষার্থীরা এ বিষয়গুলো যথাযথ ভাবে পালন করছে কি না। প্রতি পাঠের শেষে ও পাঠের আগে যথাস্থানে সরঞ্জামাদি রাখার অভ্যাস করতে হবে। এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাস, যা পরবর্তী জীবনে কাজে লাগবে। কোনো কিছু শেখা বা অনুশীলন করার সময় দরকার অনুযায়ী বন্ধুবান্ধবদের সাহায্যে করার নির্দেশ দিতে হবে। খেলাধুলার ক্লাসে বা অন্য কোনো কাজে শিক্ষার্থীরা যেন স্বার্থপরতা না দেখায় এবং তাদের দায়িত্ববোধ ও দলীয় মনোভাব গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে একে অন্যকে সাহায্য করার প্রবণতা গড়ে উঠে। শিক্ষার্থীদের বুঝাতে হবে,তোমরা সবাই একে অপরের বন্ধু। খেলার

মাঠে খেলাধুলার সরঞ্জাম নিয়ে যাওয়া এবং খেলা শেষে সেসব সরঞ্জাম ফিরিয়ে নিয়ে এসে যথাস্থানে গুছিয়ে রাখার অভ্যাস গঠন করতে হবে। তা ছাড়া খেলাধুলার সরঞ্জামাদি নিয়ে এলেই হবে না। সরঞ্জামাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে গুছিয়ে রাখতে হবে। এসব কার্য দলনেতাকে সাথে নিয়ে করতে হবে। কোনো কারণে সরঞ্জামাদি ভিজে গেলে তা মুছে শুকিয়ে রাখার নির্দেশ দিতে হবে; যাতে শিক্ষার্থীরা বোঝে যে, মুছে রাখলে সরঞ্জামাদির কোনো ক্ষতি হয় না।

শিখন শেখানো কার্যাবলি : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের স্পষ্টভাবে ধারণা দেবেন যে খেলাধুলার সরঞ্জামাদি খেলার মাঠে নিয়ে যাওয়া ও নিয়ে আসার দায়িত্ব তাদেরই। দলনেতা তা তদারকি করবে। প্রয়োজন হলে দলনেতা নিজেই খেলাধুলার সরঞ্জামাদি মাঠে আনা-নেয়া এবং যত্নসহকারে যথাস্থানে তুলে রাখবে। শ্রেণিকক্ষে, বিদ্যালয়ে ও খেলার মাঠে খেলাধুলার সরঞ্জামাদি আনা-নেয়ার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট ধারণা দিতে হবে; যাতে তারা আগ্রহভরে এ কাজটি সম্পাদন করে।

পরিকল্পিত কাজ : শ্রেণিকক্ষে ও খেলার মাঠে তোমরা বন্ধুদের সাহায্য কর কি? খেলার মাঠে কীভাবে পরস্পরকে সাহায্য করা যায় ইত্যাদি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে জেনে নিতে হবে যে তারা খেলার সরঞ্জামাদি নিজেরাই মাঠে আনা–নেয়া করছে কি না? সরঞ্জামাদির যত্ন করবে এবং যথাস্থানে সংরক্ষণ করবে। এ সম্পর্কে শিখেছে কি না। বৃষ্টিতে বা অন্য কোনো কারণে সরঞ্জামাদি ভিজে গেলে কীভাবে রাখবে এবং কোথায় রাখবে তা শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে করবে।

মূল্যায়ন :

১। শ্রেণিকক্ষে ও খেলার মাঠে একে অপরকে কীভাবে সাহায্য করবে?

২। খেলাধুলার সরঞ্জামাদি মাঠে আনা-নেয়ার ব্যাপারে কীভাবে দলনেতাকে সাহায্যে করবে?

৩। সরঞ্জাম ভেজা থাকলে কী করতে হয়?

৪। খেলা শেষে দলনেতার কাজ কী?

পঞ্চম অধ্যায়

পরিমিত খেলাধুলা, বিশ্রাম ও ঘুম

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

৫.১ স্বাস্থ্য রক্ষায় পরিমিত খেলাধুলা, বিশ্রাম ও ঘুমের উপকারিতা জানবে ও তা অনুশীলন করতে পারবে।

৫.২ সময়মতো ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠার মাধ্যমে সুস্থ দেহ ও সুন্দর মন গড়ে তুলবে।

শিখনফল :

৫.১.১ পরিমিত খেলাধুলা, বিশ্রাম ও ঘুমের প্রয়োজনীয়তা বুঝবে এবং যথারীতি এগুলো অনুশীলন করতে পারবে।

৫.২.১ সময়মতো ঘুমাতে যাওয়া এবং সকালে ঘুম থেকে উঠতে পারবে।

পাঠ বিভাজন–০২

পাঠ–০১ : স্বাস্থ্য রক্ষায় পরিমিত খেলাধুলা, বিশ্রাম ও ঘুম

শিখনফল :

৫.১.১ পরিমিত খেলাধুলা, বিশ্রাম ও ঘুমের প্রয়োজনীয়তা বুঝবে এবং যথারীতি এগুলো অনুশীলন করতে পারবে।

বিষয়বস্তু : সুস্বাস্থ্যের জন্য পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাদ্য গ্রহণের সাথে খেলাধুলা ও ব্যায়ামের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, তেমনি রয়েছে পরিশ্রান্ত দেহের জন্য পরিমিত বিশ্রাম ও ঘুমের। দেহকে সুস্থ ও সবলভাবে গড়ে তুলতে হলে পরিমাণমতো ব্যায়াম বা শরীরচর্চা এবং খেলাধুলা করা প্রয়োজন। খেলাধুলা করলে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সক্রিয় হয়, অঙ্গ সঞ্চালনের ফলে দেহে শক্তি ও সহিষ্ণুতা বাড়ে, হৃৎপিন্ড শক্তিশালী হয়, হজমশক্তি ও রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে দেহে ও মনে ফূর্তি আসে, বুদ্ধির প্রখরতা, আত্মবিশ্বাস বাড়ে, ব্যায়াম বা খেলাধুলা না করলে দেহ পুষ্ট ও মনের বিকাশ সাধন হয় না। তবে এই খেলাধুলা বা ব্যায়াম হতে হবে পরিমিত। অপরিমিত খেলাধুলা বা ব্যায়াম দেহে ও মনে বিরূপ প্রভাব ফেলে। এর ফলে দেহের উপকার না হয়ে

ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত পরিমাণে খেলাধুলা বা ব্যায়াম করা উচিত। ব্যায়াম, খেলাধুলা বা পরিশ্রমের ফলে শরীর ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ে। পেশি সমূহের ক্লান্তি ও স্নায়ুতন্ত্রের অবসাদ দূর করার জন্য বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন। বিশ্রামের ফলে দেহ ও মস্তিষ্কের অবসাদ দূর হয় এবং নতুন উদ্যমে পুনরায় কাজ করার শক্তি ফিরে পাওয়া যায়। আর এই বিশ্রামের জন্য ঘুমের প্রয়োজন হয় সবচেয়ে বেশি। এ বয়সে শিশুর জন্য ৯/১০ ঘন্টা ঘুমালে ভালো হয়। গভীর ঘুম শরীরের সকল ক্লান্তি দূর করে কারণ, নিদ্রার সময় শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে বিশ্রামে থাকে এবং শ্বাস–প্রশ্বাস ক্রিয়া ও হজম শক্তি সুচারুরূপে পরিচালিত হয়। তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাজগুলো থেকে বিরত থাকার অভ্যাস গঠন করতে হবে। স্বল্প বিশ্রাম, অপর্যাপ্ত নিদ্রা যেমন ক্ষতিকর, তেমনি অতিরিক্ত বিশ্রাম ও ঘুমও ক্ষতিকর। অধিক বিশ্রাম ও ঘুমের ফলে দেহ অলস ও দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে কোনো কাজে মন বসে না। কাজেই একটানা খেলাধুলা না করে পরিমিত বিশ্রাম ও ঘুমের পর খেলাধুলার অভ্যাস গঠনের পরামর্শ দিতে হবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি : স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের জন্য পরিমিত খেলাধুলার গুরুত্ব প্রাত্যহিক সমাবেশে, খেলাধুলার ক্লাসে গল্পের মাধ্যমে সহজভাবে বুঝাতে হবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবকিছুই ক্ষতিকর-শিক্ষক তা বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে পারেন। খেলাধুলার ক্লাসে কাউকে অতিরিক্ত কিছু করতে দেখলে তা সাথে সাথে বন্ধ করে দেবেন। শিক্ষক বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পরিমিত খেলাধুলা, বিশ্রাম ও ঘুমের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দেবেন। যেমন–পরিমিত খেলাধুলা বলতে তোমরা কী বোঝ, অতিরিক্ত খেলাধুলা করলে কী ক্ষতি হয়, কখন তোমরা বিশ্রাম কর, বেশি ঘুমালে শরীরের কী অসুবিধা হয়। তিনি প্রয়োজনবোধে এ বিষয়গুলো পোস্টারে লিখে ক্লাসে বা খেলার মাঠে টাঙিয়ে দিতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ : খেলাধুলা করলে কী করণে দেহ ক্লান্ত হয়? ক্লান্তি দূর করতে গেলে কী করতে হবে? কখন ঘুমাতে যাওয়া উচিত? বেশি ঘুমালে শরীর দুর্বল হয় কেন ? শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে বাড়ি থেকে উত্তর লিখে নিয়ে আসবে। অতিরিক্ত খেলাধুলা, বিশ্রাম ও ঘুমের অপকারিতা শিক্ষার্থীরা বোর্ডে এবং এর উপর শিক্ষক ক্লাসে আলোচনা করবেন।

মূল্যায়ন :

১। পরিমিত খেলাধুলা ও ব্যায়ামের উপকারিতা কী?

২। বিশ্রাম নিতে হয় কেন?

৩। প্রতিদিন কতটুকু সময় খেলাধুলা করা উচিত?

৪। সারা দিনের কর্মক্লান্তি ও শ্রান্তির পর সুনিদ্রা শরীর ও মনে কী পরিবর্তন আনে?

৫। অধিক বিশ্রাম , ঘুম দেহে কী প্রভাব ফেলে?

পাঠ–০২ : সময়মতো ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠার অভ্যাস।

শিখনফল :

৫.২.১ সময়মতো ঘুমাতে যাওয়া এবং সকালে ঘুম থেকে উঠতে পারবে।

বিষয়বস্তু : খেলাধুলাবিহীন শৈশবকাল কখনো চিন্তা করা যায় না। খাওয়া, ঘুমানো ও বিদ্যালয়ের পড়াশোনার কাজের বাইরে শিশু সর্বদাই খেলতে চাইবে। আর খেলাধুলা করলে শিশুর অঙ্গ সঞ্চালন হবে, বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে এবং শিশু দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে সুন্দররূপে গড়ে উঠবে। বিদ্যালয়ে পড়াশোনার বাইরে শিশু যখন শ্রেণিশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে খেলাধুলা বা শরীরচর্চা করবে তখন তাকে পরিমিত খেলাধুলা বা ব্যায়াম করতে হবে। খেলাধুলা করার সময় নির্দিষ্ট থাকবে এবং এই সময়ের বাইরে অতিরিক্ত সময় খেলাধুলা তাকে করতে দেয়া হবে না। কারণ পর্যাপ্ত পরিমাণ খেলাধুলা শিশুর শরীরকে ক্লান্ত করে তোলে, ফলে অবসাদ আসে। শিশুর ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করার জন্য তাকে অবশ্যই বিশ্রাম নিতে হবে এবং বিশ্রাম হবে পরিমিত। পরিমিত বিশ্রাম করলে শিশুর ক্লান্তি ও অবসাদ দূর হবে। তার হজম শক্তি ভালো হবে, শরীরে ফুর্তি আসবে, পড়াশোনায় মন বসবে। শরীর সতেজ হয়ে উঠবে এবং সকল কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করতে পারবে।

শিশু যখন বৈকালিক খেলাধুলা শেষে ঘরে ফিরবে এবং পড়াশোনা শেষে ও রাতের খাবার খেয়ে বিশ্রাম নেবে, তখন তাকে ঘুমাতে হবে। এই ঘুম হচ্ছে তার বিশ্রামের অন্যতম অংশ। একটি শিশুর কমপক্ষে ৯/১০ ঘণ্টা ঘুমানোর প্রয়োজন হয়। বয়স অনুসারে ঘুমের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। যেমন–

১। ৫–৭ বছর বয়স পর্যন্ত ঘুমের পরিমাণ হবে ১০/১১ ঘন্টা।

২। ৮–১১ বছর বয়স পর্যন্ত ঘুমের পরিমাণ হবে ৯/১০ ঘন্টা।

৩। ১২–১৪ বছর বয়স পর্যন্ত ঘুমের পরিমাণ হতে পারে ৮/৯ ঘন্টা।

৪। ১৫ বছরের উর্ধ্বে হলে হবে ৬/৮ ঘণ্টা।

উপরিউক্ত চার্ট অনুযায়ী শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ঘুমাতে যাওয়া ও ঘুম থেকে উঠার অভ্যাস গড়ে তুলতে নির্দেশ দিতে পারেন। এরুপ নির্দেশ থাকলে এবং শিশুরা যত্নবান হলে তারা পরিবারে, সমাজে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পরিমিত খেলাধুলা, বিশ্রাম ও ঘুম সম্পর্কে প্রথমে উদাহরণ দিয়ে এবং গল্পের ছকে এর উপকারিতা ও অপকারিতা বুঝিয়ে বলবেন। এতে শিক্ষার্থীদের এ বিষয় সম্পর্কে মানসিক ভয় কেটে যাবে। এরপর যথাসময়ে ঘুমাতে যাওয়া ও ঘুম থেকে উঠার অভ্যাস গড়ে তোলার কথা বলবেন। তিনি বিভিন্ন সহজ প্রশ্ন করে তার উত্তরের মাধ্যমে বিষয়টি শিশুদের শিক্ষা দেবেন। যেমন– খেলাধুলা করে শরীর ক্লান্ত হলে তোমরা কী কর? আজ কে কে ঘুম থেকে দেরি করে উঠেছ? বেশিক্ষণ ঘুমালে কী অসুবিধা হয়? ঘুমের প্রয়োজনীয়তা কী? এভাবে নানা রকম প্রশ্ন করবেন। যে শিশু সঠিক উত্তর দেবে তাকে এবং অন্যদের ও উৎসাহিত করবেন।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে সময়মতো ঘুমাতে যাওয়া ও সময়মতো ঘুম থেকে উঠার সুফলগুলো বোর্ডে লিখবেন এবং সকলকে তা লিখে নিতে বলবেন। তা ছাড়া পোস্টার আকারেও এসব অভ্যাস শিক্ষার্থীদের লিখে আনতে বলবেন। শ্রেণিকক্ষে কোনো একজন শিক্ষার্থীকে তা উপস্থাপনের নির্দেশ দেবেন এবং পরে আলোচনা করে সঠিক উত্তর বাছাই করবেন।

মূল্যায়ন :

১। রাতে তোমরা কখন ঘুমাতে যাও?

২। ৮–১১ বছরের একটি শিশুর দৈনিক কত ঘন্টা ঘুমানো উচিত?

৩। সকালে দেরি করে উঠলে তোমাদের কী অসুবিধা হয়?

৪। রাতে দেরিতে খাওয়াদাওয়া করা কি ভালো?

৫। সকালে সময়মতো ঘুম থেকে উঠতে গেলে তোমাদের কী করা উচিত?

ষষ্ঠ অধ্যায়
খাদ্য, খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ ও পুষ্টি উপাদান

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা:

৬.১ খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ ও পুষ্টির উপাদান সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।

শিখনফল :

৬.১.১ খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

৬.১.২ খাদ্যের পুষ্টি উপাদান সম্পর্কে বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন–০২

পাঠ–০১ : খাদ্য ও খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ

শিখনফল :

৬.১.১ খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

বিষয়বস্তু : জীবনধারণের জন্য আমাদের খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। শিশুকালে দ্রুত দৈহিক ও মানসিক বিকাশ সাধিত হয়। তাই এ সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাদ্য দেয়া হলে শিশুর সার্বিক বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। তাহলে খাদ্য কাকে বলে, তা আমাদের জানা দরকার। যে সকল কঠিন ও তরল পদার্থ আহার করলে ক্ষুধা নিবারণ, দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধন, কর্মশক্তি উৎপাদন, দেহের তাপ সংরক্ষণ, রোগ প্রতিরোধে ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রভৃতি কাজ সুসামঞ্জস্যভাবে সাধিত হয় তাদের খাদ্য বলে। এ ছাড়া খাদ্য আরও কয়েকটি অতিরিক্ত কাজ করে থাকে। যেমন– দেহের বিভিন্ন কলার রক্ষণাবেক্ষণ এবং কয়েকটি প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও এনজাইম সরবরাহ করে। তাই শরীর ও মনের সুষম উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনে খাদ্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যথাসময়ে এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ সুস্বাস্থ্যের একটি পূর্বশর্ত। অতএব শুধু খাদ্য সম্পর্কে জানলেই হবে না, এর পুষ্টিগুণ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান থাকতে হবে। পুষ্টিগুণের পাশাপাশি খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। মানুষ বা প্রাণীর বেঁচে থাকার

জন্য বহু প্রকারের খাবার রয়েছে। বেঁচে থাকার জন্য শুধু এক ধরনের খাবার খেলে হবে না, এ জন্য বিশেষ বা বিভিন্ন উপাদানের খাবার খেতে হবে। কারণ, এক একটি খাবার শরীরের এক একটি কাজ করে। তাই খাবারের শ্রেণিবিভাগ, উপাদান সম্পর্কে ধারণা ও এর প্রয়োগ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। খাদ্যকে মোটামুটি দুটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে– (১) প্রাপ্তিস্থান হসেবে এবং (২) উপাদান হিসেবে। প্রাপ্তিস্থান হিসেবে (উৎসভিত্তিক) খাদ্যকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে– (ক) প্রার্নিজ (খ) উদ্ভিদজ (গ) খনিজ।

(ক) প্রার্নিজ– মানুষ প্রাণীদেহ থেকে যে খাদ্য আহরণ করে তাকে প্রার্নিজ খাবার বলে। যেমন– মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ঘি, মাখন ইত্যাদি।

(খ) উদ্ভিদজ– আমাদের চারপাশে বিভিন্ন গাছপালা, উদ্ভিদ, লতাগুল্ম, শস্যখেত প্রভৃতিকে সবুজ শ্যামলিমায় ভরে রেখেছে। এ সমস্ত উদ্ভিদ প্রার্নিকূল আমাদের নানা প্রকার খাদ্য সরবরাহ করে থাকে। উদ্ভিদ থেকে আহরিত খাদ্য যেমন– চাল, ডাল, আটা, তরকারি, শাকসবজি প্রভৃতিকে উদ্ভিদজ খাদ্য হিসেবে অভিহিত করা হয়।

(গ) খনিজ– খনি থেকে আহরিত খনিজ পদার্থ যেমন–ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, লৌহ, ফসফরাস ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্যের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় খাওয়া হয়।

উপাদান হিসেবে খাদ্যকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন–

১। আমিষ

২। শর্করা বা শ্বেতসার

৩। স্নেহ দ্রব্য বা তেল

৪। লবণ বা খনিজ লবণ

৫। পানি

৬। খাদ্যপ্রাণ

যে খাদ্যে এই ছয়টি উপাদান পরিমাণগত বিদ্যমান থাকে তাকে পরিপূর্ণ খাদ্য বলে। কেবল দুধের মধ্যে এই ছয়টি উপাদান পাওয়া যায় বলে দুধকে পরিপূর্ণ খাদ্য বলে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি : প্রশ্নোত্তর ও শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠটি উপস্থাপন করবেন। যেমন– ক্ষুধা পেলে খাদ্য গ্রহণ করি, কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য আমাদের কীভাবে খাদ্য নির্বাচন করতে হবে? বিভিন্ন উপাদানের খাবার না খেলে আমাদের শরীর কী হবে? খাদ্যের যে বিভিন্ন

উপাদান আছে সে সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন কেন? কোন কোন উৎস থেকে খাদ্য পাই? খাদ্যের শ্রেণি বিভাগ কী? ইত্যাদি প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা কোনো বিষয় ঠিকমতো বুঝতে না পারলে শিক্ষক তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ : খাদ্যের শ্রেণিবিভাগের একটি চার্ট শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা তৈরি করে বোর্ডে ঝুলিয়ে দেবে। শিক্ষার্থীরা তা দেখে নিজেদের খাতায় লিখে নেবে। শিক্ষক ছাত্রদের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে পাঠ উপস্থাপন করবেন।

মূল্যায়ন :

১। খাদ্য কাকে বলে ?

২। কোন খাদ্যকে পরিপূর্ণ খাদ্য বলে এবং কেন?

৩। বেঁচে থাকার জন্য আমাদের কীভাবে খাদ্য গ্রহণ করতে হবে?

৪। খাদ্যকে মোটামুটি কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং কী কী?

৫। ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, লৌহ প্রভৃতি কোন ধরনের পদার্থ এবং কীভাবে আমরা তা গ্রহণ করে থাকি?

পাঠ–০২ : খাদ্যের পুষ্টি উপাদান

শিখনফল :

৬.১.২ খাদ্যের পুষ্টি উপাদান সম্পর্কে বলতে পারবে।

বিষয়বস্তু : খাদ্য আমাদের ক্ষুধা নিবারণ করে, দেহের ক্ষয়পূরণ ও তাপশক্তি উৎপাদন করে। দৈনিক খাবার গ্রহণ আমাদের দেহকে সবল করে ও দেহের কর্মশক্তি বাড়ায়। তাই সাধারণত খাদ্য বলতে আমরা দৈনন্দিন যা খাই যেমন ভাত, রুটি, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, শাকসবজি, পিঠা, মিষ্টি, বিভিন্ন ফল, চিনি, গুড়, তেল, লবণ, ঘি, মাখন, পনির, পানি ইত্যাদিকে বোঝায়। আবার উপরিউক্ত দ্রব্যাদির এক বা একাধিক উপাদানে তৈরি খাবারকেও আমরা খাদ্য বলি। তবে আমরা যে খাবারই খাই না কেন, উপাদান হিসেবে তাকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন–

১। আমিষ: যে খাদ্য দেহের বৃদ্ধি সাধন ও ক্ষয় পূরণ করে, তাকে আমিষজাতীয় খাদ্য বলে। আমিষ দুই প্রকার। যথা– (১) প্রাণিজ আমিষ– মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি। (২) উদ্ভিদজ আমিষ– চাল, ডাল, গম, ভুট্টা ইত্যাদি। খাদ্যের ছয়টি উপাদানের মধ্যে মানবদেহে আমিষের প্রয়োজন সর্বাধিক। দেহের গঠন কাঠামো,

বয়স, পরিপাকক্ষমতা প্রভৃতির উপর আমিষের চাহিদা নির্ভর করে।

২। শর্করা বা শ্বেতসারজাতীয় খাদ্য : যে খাদ্য দেহের সর্বাধিক শক্তির চাহিদা পূরণ করে তাকে শর্করা বা শ্বেতসারজাতীয় খাদ্য বলে। চাল, আটা, ময়দা, আলু, গাজর, আখ, চিনি প্রভৃতি থেকে শর্করা পাওয়া যায়। শর্করা মানুষের শরীরের শতকরা ৫০ থেকে ৭০ ভাগ তাপ ও শক্তির চাহিদা পূরণ করে।

৩। স্নেহ বা চর্বিজাতীয় খাদ্য : যে খাদ্য দেহের গঠন রক্ষা, সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও কর্মশক্তি উৎপাদন করে তাকে স্নেহজাতীয় খাদ্য বলে। স্নেহ জাতীয় খাদ্য কঠিন বা অর্ধ তরল অবস্থায় থাকলে তাকে চর্বি আর তরল অবস্থায় থাকলে তাকে তেল বলে। ঘি, মাখন, বিভিন্ন প্রকার ভোজ্য তেল, ডালডা, চিনা বাদাম, কাজু বাদাম, মাছ, মাংস, ডিম, দুধে স্নেহ জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। কায়িক পরিশ্রম ও বয়সের তারতম্যভেদে দেহে স্নেহ জাতীয় পদার্থের চাহিদা নির্ভর করে।

৪। লবণ বা খনিজ লবণজাতীয় খাদ্য : খাদ্যের যে উপাদান দেহে রক্ত ও বিভিন্ন তরল পদার্থ গঠন ও পরিমাণগত দিক ঠিক রাখে এবং হাড় ও দাঁতের গঠনে সহায়তা করে তাকে খনিজ লবণজাতীয় খাদ্য বলে। জীবন ধারণের জন্য কয়েক ধরনের খনিজ লবণ একান্ত প্রয়োজন। এ সকল খনিজ লবণ বিভিন্ন খাদ্যে পানির সাথে গৃহীত হয়। সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ প্রভৃতি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের খনিজ পদার্থ।

৫। পানি: পানি দেহের অপরিহার্য অংশ। দেহের প্রতিটি কোষের চারপাশে এবং কোষের অভ্যন্তরে পানি থাকে। মানুষের দেহের ৬০ থেকে ৭০ ভাগ হচ্ছে পানি। মানুষ প্রয়োজনীয় পানির দুই-তৃতীয়াংশ সরাসরি গ্রহণ করে এবং অপর এক-তৃতীয়াংশ বিভিন্ন খাদ্যের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করে। পানি দেহকোষের সজীবতা রক্ষা, তন্ত্র গঠন, রক্ত তারল্য বজায় এবং মলমূত্র ও ঘাম উৎপাদনে সাহায্য করে। তা ছাড়া দেহে তা পর সমতা রক্ষা করে ও কোষ্ঠ্যকাঠিন্য দূর করে পরিপাক কাজে সহায়তা করে।

৬। খাদ্যপ্রাণ: খাদ্যের অতিরিক্ত সহায়ক শক্তিবিশিষ্ট জৈব পদার্থগুলোকে খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন বলে। খাদ্যপ্রাণ দেহকোষ, কলাসমূহের স্বাভাবিক গঠন ও বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য উপাদান। খাদ্যপ্রাণ পানিতে ও চর্বিতে দ্রবণীয় অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। ভিটামিন বি কমপ্লেক্স (বি–১, বি–২) পাওয়া যায় দুধ, চিনি, বাদাম, সবুজ শাক সবজিতে এবং ভিটামিন সি টকজাতীয় ফল যেমন– আমড়া, আমলকী, পেয়ারা, আনারস, কাঁচা আম, জাম, লেবু টমেটো ইত্যাদিতে থাকে। চর্বিতে যে সকল ভিটামিন দ্রবীভূত থাকে তা হচ্ছে ভিটামিন এ, ডি, কে, ই।

শিখন শেখানো কার্যাবলি : শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে খাদ্যের পুষ্টি উপাদান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রথমে ধারণা দেবেন। এরপর পুষ্টি উপাদানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশ্ন করবেন। যেমন– সাধারণ খাদ্য বলতে আমরা কী কী খাবারকে বুঝি ? আমরা দৈনিক যেসব খাবার খাই তার কয়েকটি নাম বল? খাদ্যকে কয়টি উপাদানে ভাগ করা যায় এবং কী কী? আমিষ ও শর্করাজাতীয় খাদ্য কোনগুলো তা বুঝিয়ে দেবেন। শরীরের কত ভাগ পানি? পানি শরীরের কী কাজ করে? তোমরা আজ কী খাবার খেয়ে এসেছ এবং তা খাদ্যের কোন উপাদান বল? এভাবে নানা রকম প্রশ্ন করে তার উত্তর জানার চেষ্টা করবেন। শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়টিকে সহজভাবে উপস্থাপন করবেন।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন খাবারের ছবি বা নাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষক খাদ্য উপাদানের তালিকা বা পোস্টার শ্রেণিকক্ষে কিংবা বিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান স্থানে টাঙিয়ে রাখবেন, যাতে শিক্ষার্থীরা তা দেখতে পায় এবং খাদ্য উপাদান সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে উপাদান অনুসারে বিভিন্ন খাদ্যকে শ্রেণিবিন্যাস করে তালিকা তৈরি করবে।

মূল্যায়ন :

১। খাদ্যের উপাদান কয়টি ও কী কী?
২। আমিষজাতীয় খাদ্য কত প্রকার ও কী কী?
৩। একটি শিশুর দৈনিক কী পরিমাণ আমিষের দরকার হয়?
৪। শর্করাজাতীয় খাবার শরীরের কী চাহিদা পূরণ করে?
৫। খনিজ লবণজাতীয় কয়েকটি খাবারের নাম উল্লেখ কর।
৬। পানি শরীরের কী কী কাজ করে?
৭। কোন খাবার থেকে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স পাওয়া যায়?
৮। কোন কোন ভিটামিন চর্বিতে দ্রবণীয় অবস্থায় পাওয়া যায়?

সপ্তম অধ্যায়

দৈনন্দিন জীবনে দুর্ঘটনা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

৭.১ খেলাধুলা চলাকালীন সম্ভাব্য দুর্ঘটনা ও দুর্ঘটনার জন্য সতর্কতা অবলম্বনের বিভিন্ন পদ্ধতি জানবে এবং তা অনুসরণ করতে পারবে।

৭.২ বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় করণীয় কাজ সম্পর্কে বলতে পারবে।

৭.৩ আগুন লাগলে করণীয় কাজ সম্পর্কে জানতে পারবে।

শিখনফল :

৭.১.১ খেলাধুলা চলাকালীন কী কী দুর্ঘটনা ঘটে তা বলতে পারবে।

৭.১.২ খেলাধুলায় দুর্ঘটনার জন্য সতর্কতা অনুসরণ করতে পারবে।

৭.২.১ বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ঘটলে প্রথমে বিদ্যুতের মেইন সুইচ বন্ধ করে দিতে হয় তা বলতে পারবে।

৭.৩.১ বাড়িতে বা আশপাশে আগুন লাগলে শহর এলাকায় অবস্থিত দমকল অফিসে দ্রুত খবর দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন–০৩

পাঠ–০১ : খেলাধুলায় সংঘটিত দুর্ঘটনা ও সতর্কতা অবলম্বন

শিখনফল :

৭.১.১ খেলাধুলা চলাকালীন কী কী দুর্ঘটনা ঘটে তা বলতে পারবে।

৭.১.২ খেলাধুলায় দুর্ঘটনার জন্য সতর্কতা অনুসরণ করতে পারবে।

উপকরণ : কাঁচি, ডেটল, জীবাণুমুক্ত তুলা, বিভিন্ন প্রকার ব্যান্ডেজ, বরফ, চটা (স্প্লিন্ট)।

বিষয়বস্তু : খেলাধুলা ও ব্যায়াম করার সময় মাঝে মাঝে ব্যাথা পাওয়া, মচকে যাওয়া, মাসলপুল হওয়া-এ সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটা স্বাভাবিক। এ সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটলে জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ে। অনেক সময় চিকিৎসক পেতে দেরি হয়। সে জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা আবশ্যক হয়ে পড়ে। বিভিন্ন দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য

নিম্নলিখিত সতর্ককতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

১. খেলাধুলা ও ব্যায়াম করার পূর্বে শরীরকে গরম করতে হবে। ঠিকমতো শরীর গরম না করে খেলাধুলা শুরু করলে ছোট ছোট আঘাত ও মাংসপেশিতে টান ধরতে পারে।

২. কোনো স্থানে খেলাধুলা শুরু করার পূর্বে উক্ত স্থানটি ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে।

৩. অতিরিক্ত ব্যায়াম করা উচিত নয়। এতে উপকারের চেয়ে ক্ষতি হয় বেশি।

৪. সঙ্গীর সাথে ব্যায়াম করার সময় নিজের ওজন ও উচ্চতা অনুযায়ী সঙ্গী বেছে নিতে হবে।

৫. পিচ্ছিল, ভেজা ও ইটপাটকেলযুক্ত মাঠে খেলাধুলা করা উচিত নয়। এতে আঘাত পাওয়ার আশঙ্কা থাকে বেশি।

৬. দা, কাস্তে , ছুরি, ব্লেড বা ধারালো কোনো বস্তু দ্বারা খেলাধুলা করা উচিত নয়।

৭. দিয়াশলাই, আগুন ও পটকাজাতীয় জিনিস দিয়ে খেলা করা উচিত নয়।

৮. বৈদ্যুতিক খুঁটির ধারে খেলাধুলা করা ঠিক নয়।

খেলাধুলা করার সময় সচরাচর যে সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটে নিম্নে তা তুলে ধরা হলো :–

ক. মাসলপুল বা মাংসপেশিতে টান ধরা : খেলাধুলা করতে বা ভারী কোনো জিনিস তোলার সময় মাংসপেশি সংকুচিত হয়ে ব্যাথা অনুভূত হয় এবং চলতে গিয়ে খুব কষ্ট হয়। কোনো সময় আহত স্থান ফুলে ওঠে এবং কালশিরা পড়ে যায়। এ অবস্থাকে মাসলপুল বা মাংসপেশিতে টান লাগা বোঝায়। এ রকম হলে আহত স্থানকে বিশ্রাম দিয়ে ম্যাসেজ করতে হবে এবং বরফ লাগাতে হবে। চব্বিশ ঘণ্টা পর গরম পানিতে বোরিক অ্যাসিড পাউডারের কমপ্রেস প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজন হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

খ. চোখে ধুলাবালি ঢোকা : খেলাধুলা করার সময় চোখের মধ্যে ধুলাবালি, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি ঢুকে পড়লে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনো এটা সামান্য থেকে গুরুতর আকার ধারণ করে। গ্রামের মাঠ অনেক সময় কর্দমাক্ত থাকে। খেলার সময় পড়ে গিয়ে মুখে ও চোখে কাদা–মাটি মেখে যায়। এ রকম অবস্থা হলে–

১. রোগীর চোখ কখনোই রগড়ানো যাবে না।

২. চোখের পাতা ফাঁক করে দেখতে হবে চোখের ভেতর কিছু দেখা যায় কি না। দেখা গেলে পরিষ্কার কাপড় পানিতে হালকা ভিজিয়ে কাপড়ের কোনা দিয়ে তা বের করতে হবে।

৩. চোখমুখে পানির ঝাপটা দিয়ে চোখ পরিষ্কার করবে।

৪. কাদা ভরে গেলে চোখ বন্ধ রেখে বারবার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

৫. এর পরেও অস্বস্তিবোধ করলে ডাক্তারের কাছে পাঠাতে হবে।

গ. রক্তপাত : খেলাধুলা করার সময় মুখে আঘাত লেগে দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত বের হতে পারে। আবার কোনো স্থানে কেটে গিয়েও রক্তপাত হতে পারে।

রক্তপাত বন্ধের উপায় :

১. দাঁতের গোড়া বা মুখের ভেতর কোনো স্থান কেটে গিয়ে রক্ত বের হলে উক্ত স্থানে বরফ লাগাতে হবে এবং রোগীকে বিশ্রাম দিতে হবে।

২. শরীরের কোনো অংশ কেটে গিয়ে রক্তপাত হলে কাটা স্থানটি আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরতে হবে। উক্ত স্থানে বরফ লাগাতে হবে। এর পরেও রক্ত পড়া বন্ধ না হলে আহত অঙ্গটি রক্ত চলাচল লেবেলের উপর তুলে ধরতে হবে। জীবাণুমুক্ত তুলা দিয়ে চেপে ধরে ব্যান্ডেজ করতে হবে এবং ডাক্তারের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি : খেলাধুলা করার সময় কীভাবে সতর্কতা অবলম্বন করবে, শিক্ষক তা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন। খেলাধুলার সময় কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে কীভাবে তার প্রাথমিক চিকিৎসা করতে হবে তা হাতে-কলমে দেখিয়ে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ : খেলাধুলা করার সময় কী কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় তার একটি তালিকা প্রস্তুত করে উপস্থাপন কর। মাসলপুল হলে তার প্রাথমিক চিকিৎসার একটি চার্ট করে টাঙিয়ে দাও। রক্তপাত বন্ধের উপায়সমূহ বর্ণনা কর।

পাঠ–০২ : বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ও সতর্কতা অবলম্বন।

শিখনফল :

৭.২.১ বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ঘটলে প্রথমে বিদ্যুতের মেইন সুইচ বন্ধ করে দিতে হয় তা বলতে পারবে।

উপকরণ : শুকনা ডাল বা বাঁশ।

বিষয়বস্তু : অসাবধানতাবশত কেউ বিদ্যুতের তারের সাথে জড়িয়ে গেলে বা কেউ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলে সাথে সাথে মেইন সুইচ বন্ধ করে দিতে হবে। কোনো কারণে মেইন সুইচ বন্ধ করতে না পারলে শুকনা কাঠ দিয়ে ধাক্কা দিয়ে ছাড়িয়ে দিতে হবে। কাঠ না পেলে শুকনা কাপড় হাতে জড়িয়ে ধাক্কা দিতে হবে। কখনো খালি হাতে কাউকে ধরবে না। খালি হাতে ধরলে যে ধরবে তারও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বিপদ ঘটতে পারে। কখনো পানি গায়ে দেবে না। শ্বাস ক্রিয়া না চললে রোগীকে উপুড় করে শুইয়ে পিঠে চাপ দিয়ে শ্বাসকার্য চালানোর চেষ্টা করবে। পরে ডাক্তারের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি : কেউ বিদ্যুস্পৃষ্ট হলে তাকে কীভাবে ছাড়াতে হবে তার পদ্ধতি বুঝিয়ে দেবেন। শুকনা কাঠ বা বাঁশ দিয়ে কেন ধাক্কা দিতে হয় সে সম্বন্ধে ধারণা দেবেন। শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হলে কীভাবে শ্বাস ক্রিয়া চালাতে হবে তাও দেখিয়ে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ : কেউ বিদ্যুতের তারের সাথে জড়িয়ে গেলে তাকে কীভাবে ছাড়াতে হয় তা ক্লাসে শিক্ষার্থীরা উপস্থাপন করবে। শুকনা কাঠ দিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টকে কীভাবে ছাড়াতে হয় তা প্রদর্শন করো। শ্বাসকার্য না চললে কীভাবে শ্বাসকার্য চালু করতে হয় তা একজন শিক্ষার্থীকে সাথে নিয়ে ধরে দেখাবে।

মূল্যায়ন :

১। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট কাকে বলে?

২। তারে জড়িয়ে গেলে কীভাবে ছাড়াতে হয় বল?

৩। কীভাবে শ্বাসকার্য চালু করতে হয়?

পাঠ–০৩ : বাড়িতে বা আশপাশে আগুন লাগলে করণীয়।

শিখনফল :

৭.৩.১ বাড়িতে বা আশপাশে আগুন লাগলে শহর এলাকায় অবস্থিত দমকলকে দ্রুত খবর দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারবে।

বিষয়বস্তু : নিজ বাড়িঘরে, আশপাশের বাড়িতে বা দোকানপাটে আকস্মিকভাবে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। দুর্ঘটনার মূল কারণ হলো অসাবধানতা। বর্তমান যুগে বিদ্যুতের ব্যাপক ব্যবহার ও রকমারি বৈদ্যুতিক ব্যাপক প্রসারে সুইচ, ইলেকট্রিক স্টোভ, হিটার, ইস্ত্রি, ভোল্টেজ স্টাবিলাইজার, মাল্টিপ্লাগ ইত্যাদি জিনিস ব্যবহৃত হয়। এগুলোর ত্রুটি থাকলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। যদি ইলেকট্রনিক তারে আগুন লাগে তা দ্রুত আশপাশের ঘরে ছড়িয়ে যায়। প্রথমে মেইন সুইচ বন্ধ করতে হয়,পরে অনান্য কাজ করতে হবে। চুলা বা সিগারেটের আগুন থেকেও বাড়ি বা আশপাশে আগুন লাগলে শহর এলাকায় টেলিফোন বা লোকের মাধ্যমে দ্রুত দমকল অফিসে খবর দিতে হবে। গ্রামাঞ্চলে যেখানে দমকল অফিস নেই,সেখানে চিৎকার করে লোক জড়ো করতে হবে। উপস্থিত লোকের সাহায্যে বালি/পানি/মাটি ইত্যাদি দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করতে হবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি : আগুন লাগার কারণগুলো শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন। গ্রামাঞ্চলে আগুন নেভানোর উপায়গুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করে শ্রেনিকক্ষে আলোচনা করবেন । শহরাঞ্চলে দমকল বাহিনীকে কীভাবে খবর দিতে হয় তা বোর্ডে লিখতে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থী আগুন লাগার উৎসগুলো বোর্ডে লিখে বর্ণনা করবে। গ্রামাঞ্চলে আগুন নেভানোর উপায়গুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করবে। শহরাঞ্চলে দমকল বাহিনীকে কীভাবে খবর দিতে হয় তা মহড়া করে দেখাবে।

মূল্যায়ন :

১. আগুন লাগার কারণগুলো বর্ণনা কর।

২. গ্রামাঞ্চলে আগুন নেভানোর উপায়সমূহ আলোচনা কর।

৩. শহরে আগুন লাগলে কী করতে হয়?

অষ্টম অধ্যায়
প্রাথমিক চিকিৎসা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

৮.১ দুর্ঘটনায় অঙ্গ-প্রতঙ্গের ক্ষতি হলে তার তাৎক্ষণিক প্রতিবিধান সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৮.২ বিভিন্ন দুর্ঘটনার প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে জানতে ও প্রয়োগ করতে পারবে।

শিখনফল :

৮.১.১ দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রাথমিক প্রতিবিধান ড্রেসিং, ব্যান্ডেজ কীভাবে করতে হয় তা শিখতে পারবে।

৮.২.১ বিভিন্ন দুর্ঘটনার প্রাথমিক চিকিৎসা কী, তা শিখবে ও প্রয়োগ করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন–০২

পাঠ–০১ : ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ড্রেসিং ও ব্যান্ডেজ

শিখনফল :

৮.১.১ দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রাথমিক প্রতিবিধান ড্রেসিং, ব্যান্ডেজ কীভাবে করতে হয় তা শিখতে পারবে।

উপকরণ : স্যাভলন, আয়োডিন, বেনজিন, তুলা, কাঁচি, স্প্লিন্ট, ব্যান্ডেজ, গজ, লিউকোপ্লাস্টার ও আইস ব্যাগ।

বিষয়বস্তু : ব্যান্ডেজ বাধার পূর্বে ক্ষতস্থানটি পরিষ্কার করে জীবাণুমুক্ত তুলা বা গজে ওষুধ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করার উপযোগী করাকে ড্রেসিং বলে। রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে ও বাইরের রোগজীবাণু যেন প্রবেশ করতে না পারে, সে জন্য ড্রেসিং করা হয়। ক্ষতস্থানটি ড্রেসিং, প্যাড, চটা প্রভৃতি দ্বারা স্থির রাখার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাকে ব্যান্ডেজ বলে। ব্যান্ডেজ দুই প্রকার হয়– (ক) ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ (খ) রোলার ব্যান্ডেজ। ত্রিকোণ ব্যান্ডেজকে একঁ ভাজ করলে তাকে ব্রড ব্যান্ডেজ বলে। আবার পর পর কয়েক ভাঁজ করলে তাকে সরু ব্যান্ডেজ বলে। কাপড় গোল করে যে ব্যান্ডেজে ব্যবহার করা হয় তাকে রোলার ব্যান্ডেজ বলে। পাতলা

সুতি কাপড় দিয়ে রোলার ব্যান্ডেজ তৈরি করা হয়। রোলার ব্যান্ডেজ এক ইঞ্চি থেকে ছয় ইঞ্চি পর্যন্ত চওড়া হয়।

১. রিস্ট ব্যান্ডেজ: হাতে বা কবজিতে লেগে হাড় ভেঙে গেলে কিংবা মচকে গেলে উক্ত আঘাতপ্রাপ্ত স্থানকে স্থির বা অনড় রাখার জন্য যে ব্যান্ডেজ করা হয় তাকে রিস্ট ব্যান্ডেজ বলে।

রিস্ট ব্যান্ডেজ

২. পাম ব্যান্ডেজ: হাতের তালুতে যখন ব্যান্ডেজ করা হয় তাকে পাম ব্যান্ডেজ বলে। এখানে রোলার ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা হয়।

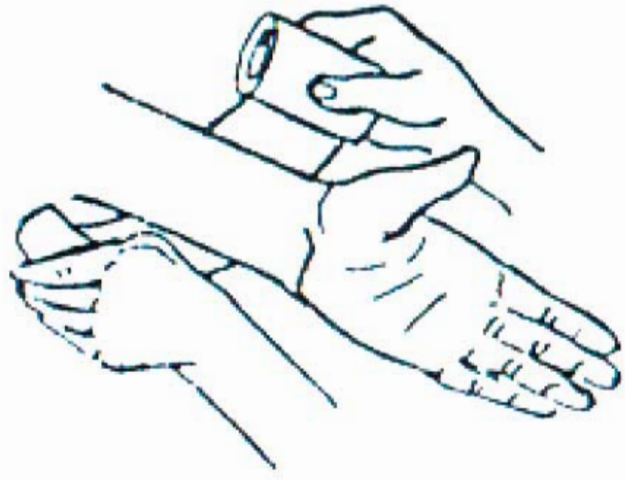

পাম ব্যান্ডেজ

৩. অ্যাংকেল ব্যান্ডেজ : পা ও গোড়ালির সন্ধিস্থল আঘাতপ্রাপ্ত হলে ঐ স্থানকে স্থির করার জন্য যে ব্যান্ডেজ দিতে হয় তাকে অ্যাংকেল ব্যান্ডেজ বলে।

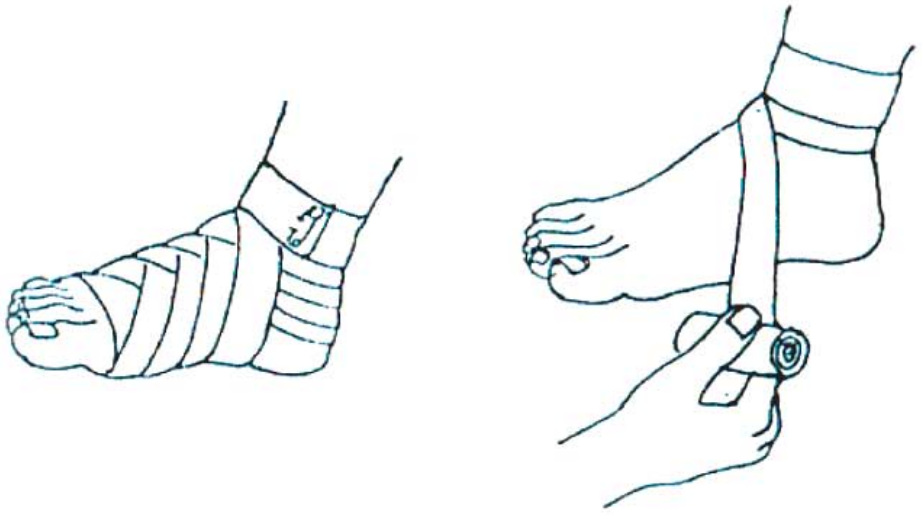

অ্যাংকেল ব্যান্ডেজ

শিখন শেখানো কার্যাবলি : ড্রেসিং কখন করতে হয়, ড্রেসিংয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন। ব্যান্ডেজ কত প্রকার? কোন ব্যান্ডেজ কোথায় করতে হয়, তা ব্যবহারিকভাবে শিখিয়ে দেবেন। রিস্ট, পাম ও অ্যাংকেল ব্যান্ডেজ বাঁধার কৌশল দেখিয়ে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ : ড্রেসিংয়ের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করবে। ব্যান্ডেজ কত প্রকার, নামগুলো কী কী? তার একটি তালিকা প্রস্তুত করবে। বিভিন্ন প্রকার ব্যান্ডেজএর চিত্র অঙ্কন করবে। রিস্ট, পাম ও অ্যাংকেল ব্যান্ডেজ গ্রুপ করে অনুশীলন করবে।

মূল্যায়ন :

১. ড্রেসিং কেন করতে হয়?

২. ব্যান্ডেজ কত প্রকার ও কী কী বর্ণনা কর ।

৩. রিস্ট ব্যান্ডেজ করে দেখাও।

৪. রিস্ট, পাম ও অ্যাংকেল কাকে বলে?

পাঠ–০২ : বিভিন্ন দুর্ঘটনার প্রাথমিক চিকিৎসা

শিখনফল : ৮.২.১ বিভিন্ন দুর্ঘটনার প্রাথমিক চিকিৎসা কী, তা শিখবে ও প্রয়োগ করতে পারবে।

উপকরণ : বিভিন্ন দুর্ঘটনার পোস্টারজাতীয় ছবি।

বিষয়বস্তু : দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে বিদ্যালয়ে বা যেকোনো সময়ে আমরা দুর্ঘটনায় পতিত হতে পারি। তৎক্ষণাৎ কাছাকাছি ডাক্তার পাওয়া সম্ভব হয় না। তাই আমাদের সকলের প্রাথমিক চিকিৎসা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার। বিদ্যালয় থাকাকালীন কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে শারীরিক শিক্ষককে জরুরি ভিত্তিতে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়।

প্রাথমিক চিকিৎসার উদ্দেশ্য :

১. আহত রোগীর ক্ষতাদি যেন বৃদ্ধি না পায় তার ব্যবস্থা করা।

২. তৎক্ষণাৎ আহত ব্যক্তিকে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

৩. আহত ব্যক্তি যেন কষ্ট না পায়, বিনা চিকিৎসায় পড়ে না থাকে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪. দ্রুত ডাক্তারের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করা।

বিভিন্ন দুর্ঘটনার প্রাথমিক চিকিৎসা –

১. পানিতে ডুবে যাওয়া : চতুর্থ শ্রেণিতে তোমরা পানিতে পড়ে গেলে কীভাবে উদ্ধার করতে হয়, সে সম্পর্কে জেনেছ। পানি থেকে উদ্ধারের পর রোগীর স্বাভাবিক শ্বাসকার্য বন্ধ হয়ে গেছে বা বন্ধ হবার উপক্রম, তখন শ্বাস প্রশ্বাসের অনুকরণে রোগীকে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস দেয়ার ব্যবস্থার নাম কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া। কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া হাত দিয়ে অথবা যন্ত্রের সাহায্যে দেয়া যায়। কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়ার বিভিন্ন উপায় আছে। নিচে দুইটি পদ্ধতি আলোচনা করা হলো–

ক. সেফার পদ্ধতি : রোগীকে উপুড় করে শোয়াতে হবে। তার মুখ থাকবে নিচের দিকে। হাত দুইটি থাকবে মাথার দুই পাশে ছড়ানো। মাথা এক পাশ করে দিতে হবে, যাতে তার নাক ও মুখ মাটিতে ঠেকে না থাকে।

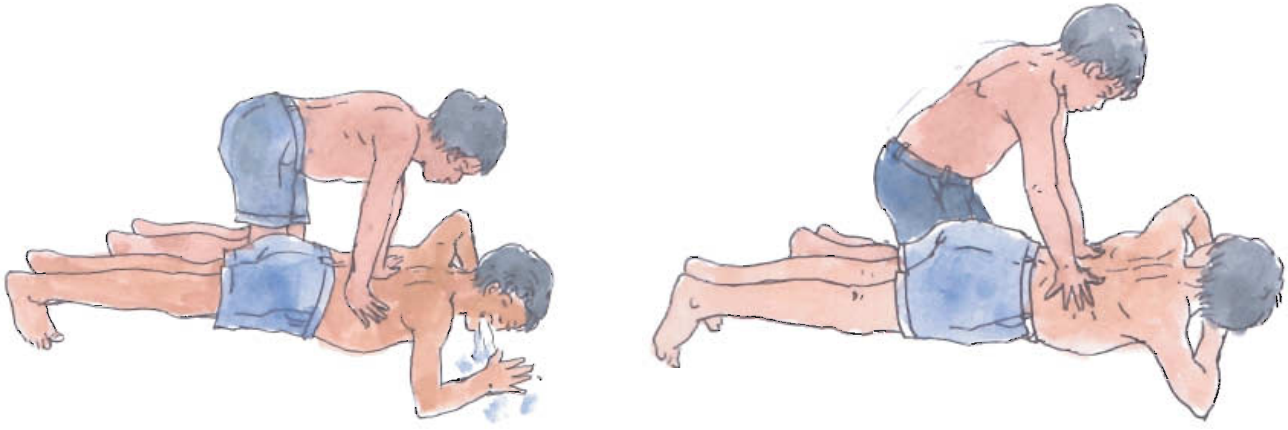

পানিতে ডোবা

রোগীর মাথার দিকে মুখ করে কোমর বরাবর সমান্তরাল হয়ে পাশে হাঁটু গেড়ে বসতে হবে। তারপর রোগীর কোমরের দুই পাশে নিজের দুটি হাত এমনভাবে রাখতে হবে, যাতে পিঠের মাঝখানে দুই হাত ছুঁই ছুঁই অবস্থায় থাকে। তারপর নিজের কনুই না বাঁকিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে চাপ দিতে হবে। এই চাপের ফলে ফুসফুসের বায়ু বেরিয়ে আসবে। তারপর ধীরে ধীরে চাপ ছেড়ে দিতে হবে। চাপ দেয়া ও ছাড়া—এই দুটি কাজ ৫ সেকেন্ডের মধ্যে করতে হবে।

২. হোলজার নেলসন পদ্ধতি : রোগীকে উপুড় করে শোয়াতে হবে। প্রাথমিক চিকিৎসক রোগীর মাথার দিকে দুই হাঁটু গেড়ে বসবে। দুই হাত রোগীর পিঠের উপর রেখে চাপ দিতে হবে। তারপর রোগীর বাহু দুটি ওঠানামা করাতে হবে। মনে রাখতে হবে, যদি সোল্ডার জয়েন্ট বা তার কাছাকাছি কোথাও অস্থি ভাঙ্গা থাকে, তাহলে এ পদ্ধতি চলবে না। চাপ দেয়ার নিয়ম

এক, দুই– পিঠে চাপ। তিন– একটু থামতে হবে।

চার, পাঁচ– বাহুতে টান সৃষ্টি। ছয়– কিছুক্ষণ থাম।

এই প্রক্রিয়ায় রোগীকে প্রতি মিনিটে ১০–১২ বার শ্বাস–প্রশ্বাস দেয়া যায়। প্রতিবারে বাতাস চলাচলের পরিমাণ এক লিটার অর্থাৎ এক হাজার মিলিমিটার।

১. সাপে কাটলে : সাপে কাটার সাথে সাথে দড়ি বা কাপড়ের টুকরা দিয়ে কাটা স্থানের উপরে দুটি বাঁধন দিতে হবে। তার উপরে আরেকটা বাঁধন দিতে হবে। বাঁধনটি এমনভাবে আঁটতে হবে যেন শিরার রক্ত চলাচল

বন্ধ হয়। শুধু ধমনির রক্ত চলাচল করতে পারে। কাছাকাছি কোনো হাসপাতাল থাকলে রোগীকে সেখানে পাঠাতে হবে। অথবা ডাক্তার ডেকে আনতে হবে। ডাক্তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি : কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া কাকে বলে এবং কীভাবে তা প্রয়োগ করতে হয়, তা বুঝিয়ে দেবেন। কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়ার দুটি পদ্ধতির নিয়ম ও কৌশল ব্যাখ্যা করে শিখিয়ে দেবেন। সাপে কাটলে তার প্রাথমিক চিকিৎসা কীভাবে করতে হয়,তার ধারণা দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থী পানিতে ডোবা রোগীর চিকিৎসা কীভাবে করবে তা, মহড়া করে দেখাবে। সাপে কাটার প্রায়োগিক চিকিৎসার তালিকা প্রস্তুত করে শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করবে এবং চিকিৎসা মহড়া করে দেখাবে।

মূল্যায়ন :

১. কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া কাকে বলে?

২. সেফার পদ্ধতি আলোচনা করো।

৩. হোলজার নেলসন পদ্ধতির প্রয়োগ দেখাও?

৪. সাপে কাটলে তার প্রাথমিক প্রতিবিধান কী,তা বর্ণনা করো।

নবম অধ্যায়

দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হওয়া

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

৯.১ প্রাত্যহিক সমাবেশ পরিচালনার মাধ্যমে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হবে ও নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন করবে।

৯.২ স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসের খেলাধুলায় অংশগ্রহণের গুরুত্ব অনুধাবন করে জাতীয় চেতনায় উদ্দীপ্ত হতে পারবে।

শিখনফল :

৯.১.১ প্রাত্যহিক সমাবেশ কীভাবে পরিচালনা করতে হয় তা বলতে পারবে।

৯.১.২ জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও দলগতভাবে জাতীয় পতাকাকে সম্মান জানানোর মাধ্যমে জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হতে পারবে।

৯.২.১ স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন–০২

পাঠ–০১ : প্রাত্যহিক সমাবেশ পরিচালনা ও সমাবেশে অংশগ্রহণ।

শিখনফল :

৯.১.১ প্রাত্যহিক সমাবেশ কীভাবে পরিচালনা করতে হয় তা বলতে পারবে।

৯.১.২ জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও দলগতভাবে জাতীয় পতাকাকে সম্মান জানানোর মাধ্যমে জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হতে পারবে।

উপকরণ : জাতীয় পতাকা , পতাকা দন্ড ও খোলা জায়গা।

বিষয়বস্তু : প্রাত্যহিক সমাবেশ সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। সরকারি নির্দেশে সব প্রতিষ্ঠানে প্রাত্যহিক সমাবেশ পরিচালিত হয়। শুষ্ক মৌসুমে বিদ্যালয়ের খোলা প্রাঙ্গণে, প্রতিকুল আবহাওয়ায় মিলনায়তনে কিংবা বারান্দায় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শারীরিক শিক্ষক ও অন্য শিক্ষকবৃন্দ সমাবেশ পরিচালনা করেন। বিদ্যালয়ের সামনে উন্মুক্ত জায়গায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের ব্যবস্থা থাকবে। পতাকার ডান পাশে প্রধান শিক্ষক, বাম পাশে শারীরিক শিক্ষক ও তাঁদের পেছনে অন্যান্য শিক্ষক দাঁড়াবেন। হাউস

বা শ্রেণি অনুসারেও দাঁড়ানো যায়। হাউস সকল স্কুলে না থাকায় বেশির ভাগ স্কুলে শ্রেণি অনুসারে দাঁড়ায়। শ্রেণির ছাত্রের সংখ্যানুসারে ফাইলে দাঁড় করাতে হবে। যারা উচ্চতায় খাটো তারা ফাইলের সামনে দাঁড়াবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে পেছনে যাবে। শ্রেণির মেয়েরা ফাইলের সামনে দাঁড়াবে। যদি মেয়েরা বেশি হয় তাহলে সব শ্রেণির মেয়েরা একত্রে আলাদা ফাইল করে দাঁড়াবে। এভাবে ছাত্র-শিক্ষক মিলিত হয়ে সমাবেশে অংশগ্রহণ করবে।

সমাবেশ পরিচালনা :

১. প্রথমে প্রধান শিক্ষক জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন এবং উক্ত সময় সকলে সোজা হয়ে থাকবে।

২. প্রধান শিক্ষক জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর এক পদক্ষেপ পিছনে এসে পতাকাকে সালাম প্রদান করবেন। সাথে সাথে ছাত্রছাত্রীরাও পতাকাকে সালাম প্রদর্শন করবে।

৩. পালাক্রমে শ্রেণির একজন ছাত্র/ছাত্রী এসে কুরআন তেলাওয়াত করবে। এ সময় সকল শিক্ষার্থী বুকে হাত রেখে দাঁড়াবে।

৪. অন্য শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী এসে শপথ পাঠ করবে। ঐ সময় শিক্ষার্থীরা ডান হাত সামনে তুলবে ও সাথে সাথে শপথবাক্য উচ্চারণ করবে।

৫. শিক্ষার্থীরা ও শিক্ষকমন্ডলী জাতীয় সংগীত একসাথে গাইবে। ঐ সময় সকলে সোজা অবস্থায় থাকবে।

৬. প্রতিষ্ঠানপ্রধানের ভাষণ প্রয়োজনবোধে।

৭. ৫ মিনিট শরীরচর্চা প্রদর্শন। তবে লক্ষ রাখতে হবে এমন ধরনের পিটি করানো যাবে না, যাতে ছেলে-মেয়েদের জামাকাপড়ে ময়লা লাগে।

৮. তারপর দলনেতা/শিক্ষকের নির্দেশে শিক্ষার্থীরা সারিবদ্ধভাবে ক্লাসে যাবে।

এভাবে সমাবেশটি পরিচালিত হবে। সমাবেশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি : সমাবেশে কীভাবে দাঁড়াবে এবং সমাবেশে আসা থেকে শুরু করে ক্লাসে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়া শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ : সমাবেশে কোন শ্রেণি কোথায় দাঁড়াবে, শিক্ষার্থী তার একটি ছক এঁকে দেখাবে। প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষক কোথায় দাঁড়াবে, তা বোর্ডে অঙ্কন করবে। সমাবেশের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কার্যক্রম পোস্টার আকারে লিখে শ্রেণিতে টাঙিয়ে দেবে।

মূল্যায়ন :

১. সমাবেশে মেয়েরা কোথায় দাঁড়াবে?

২. জাতীয় পতাকা কে উত্তোলন করবেন?

৩. শপথবাক্য কে পাঠ করাবে?

৪. কুরআন তেলাওয়াতের সময় হাত কোথায় থাকবে?

৫. জাতীয় সংগীত গাওয়ার সময় শরীরের অবস্থান কেমন হবে?

৬. সমাবেশ শেষে শিক্ষার্থীরা কীভাবে ক্লাসে ফিরে যাবে?

পাঠ–০২ : স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস

শিখনফল :

৮.২.১ স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : খোলা জায়গা/মাঠ/শ্রেণিকক্ষ

বিষয়বস্তু : স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস বাঙালি জাতির ইতিহাসের এক অনন্য অধ্যায়। তাই আমাদের জীবনে এই দিবস দুটির গুরুত্ব অপরিসীম। ২৬এ মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস। এই দিন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এ ঘোষণার প্রেক্ষিতে শুরু হয় মুক্তিসংগ্রাম। ৯ (নয়) মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মধ্যদিয়ে ১৬ই ডিসেম্বর আমরা বিজয় অর্জন করি। ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস। এই দিন আত্মত্যাগী সেই বীর যুদ্ধাদের স্মরণে সারা দেশে এই দিনটি উদযাপন করা হয়। আগামী প্রজন্মকে স্বাধীনতার ইতিহাস জানানো ও দেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এই দিবস সমূহে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিক্ষার্থীদের জাতীয় চেতনাবোধে জাগ্রত করার লক্ষ্যে স্বাধীনতার ভিডিও চিত্র, স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন ছবি, প্রদর্শন করা হয়। সেই সাথে নানাধরনের খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া বিজয় র‍্যালির ও আয়োজন করা হয়। শিক্ষক–শিক্ষার্থী সকলের অংশগ্রহনের মাধ্যমে দিবস দুটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি : স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস কী? কোন কোন তারিখে এই দিবস দুটি পালন করা হয়? এরূপ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট ধারণা দেবেন? দিবস দুটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবেন। স্বাধীনতা অর্জনের বীর সেনানীদের বীরত্বের গল্প বলে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করবেন। পাকিস্তানি হায়েনাদের নির্যাতনের ইতিহাস কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মাঝে তুলে ধরবেন। আমাদের এই ইতিহাস যে আত্মত্যাগের ইতিহাস তা শ্রেণিকক্ষে বর্ণনা করবেন। বাড়িতে মা-বাবা অথবা বড়দের কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীদের প্রথমে এক স্থানে সমবেত করে দিবস দুইটি সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিডিও চিত্র এবং বিজয় দিবসের ছবি দেখাতে হবে। পরে শিক্ষার্থীরা আনন্দপূর্ণ খেলায় অংশগ্রহণ করবে। এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস সম্বন্ধে ধারণা লাভ করবে।

মূল্যায়ন :

১. স্বাধীনতা দিবস কেন বলা হয়?
২. দিবসটি পালনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কী জাগ্রত হয়?
৩. দিবস দুটির গুরুত্ব বর্ণনা কর।
৪. দিবসটি কীভাবে পালন করা হয়?

দশম অধ্যায়

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

১০.১ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সহায়তা প্রদান করতে পারবে।

১০.২ কমান্ড মেনে নির্ভুলভাবে বাঁশির সংকেত বা বন্দুকের আওয়াজের সাথে দৌড় শুরু করতে পারবে।

১০.৩ গ্রুপ অনুসারে বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

শিখনফল :

১০.১.১ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন ও সাংগঠনিক দিকগুলো বর্ণনা করতে পারবে।

১০.১.২ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের বিভিন্ন কাজে সহায়তা করতে পারবে।

১০.২.১ সঠিকভাবে দৌড় দিতে পারবে।

১০.৩.১ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ০২

পাঠ–০১ : বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন, পরিচালনা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান।

শিখনফল :

১০.১.১ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন ও সাংগঠনিক দিকগুলো বর্ণনা করতে পারবে।

১০.১.২ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের বিভিন্ন কাজে সহায়তা করতে পারবে।

উপকরণ : মাঠ সাজানো, পতাকা, চুন, বিজয়স্তম্ভ, ডায়াস, পতাকা দন্ড ও টেবিল।

বিষয়বস্তু : বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন ও পরিচালনা অত্যন্ত কষ্টকর। ছাত্র, শিক্ষক ও অন্য স্টাফদের সহযোগিতায় একটি প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায়। প্রতিযোগিতা শুরুর প্রায় ১৫ দিন পূর্ব

থেকে প্রস্তুতি শুরু হয়। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য আয়োজনের কাজকে তিন ভাগে করা হয়।

১। প্রতিযোগিতার পূর্বের কাজ।

২। প্রতিযোগিতা চলাকালীন কাজ।

৩। প্রতিযোগিতার শেষের কাজ।

১। প্রতিযোগিতার পূর্বের কাজ : ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পাদন করার পূর্বে যে সমস্ত কাজ করা হয় তাকে পূর্বের কাজ বলে। যেমন–

ক. মাঠ প্রস্তুত খ. মাঠ সাজানো ও প্যান্ডেল তৈরি গ. দাওয়াত কার্ড ছাপানো ঘ. পুরস্কার ক্রয়, ঙ. বিচারক ঠিক করা, চ. শৃঙ্খলা ঠিক রাখার জন্য স্বেচ্ছাসেবক মনোনীত করা, ছ. স্কোরশিট ও রেজাল্ট শিট তৈরি করা, জ. ট্র্যাক ও সেক্টর প্রস্তুত করা, ঝ. প্রধান অতিথি নির্বাচন করা।

২। প্রতিযোগিতা চলাকালীন কাজ : প্রতিযোগিতার ইভেন্ট শুরু করার পূর্বে স্কোরশিট , প্রতিযোগীদের তালিকা, বিচারক ঠিক জায়গায় গেছে কি না ইত্যাদি দেখে ইভেন্ট শুরু করতে হয়। ইভেন্ট শেষ হওয়ার সাথে সাথে ফলাফল মাইকে ঘোষণা করে রেকর্ড শিটে তুলতে হয়।

৩। প্রতিযোগিতার শেষের কাজ : প্রথমে বিজয়ীদের তালিকা অনুযায়ী পুরস্কারগুলো টেবিলে সাজিয়ে রাখতে হবে। তারপর বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করবে। পুরস্কার বিতরণ শেষে সরঞ্জামাদি গুছিয়ে রাখতে হবে। সম্ভব হলে বিজয়ীদের তালিকা খবরের কাগজে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি : প্রতিযোগিতা আয়োজনের পূর্বে কী কী কাজ করতে হবে? এবং প্রতিযোগিতার সময় কীভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে, তা মহড়া দিয়ে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন। প্রতিযোগিতা শেষে সরঞ্জামাদি কীভাবে গুছিয়ে রাখবে,তার ধারণা দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতার পূর্বের কাজগুলোর তালিকা প্রস্তুত করে উপস্থাপন করবে। প্রতিযোগিতার সময় কী দায়িত্ব পালন করবে,তা বোর্ডে লিখে দেখাবে। প্রতিযোগিতা শেষের তোমাদের দায়িত্ব গুলো পোস্টারে লিখে শ্রেণিকক্ষে টাঙিয়ে দেবে।

মূল্যায়ন :

১। প্রতিযোগিতার পূর্বের কাজগুলো বর্ণনা করো।

২। প্রতিযোগিতার সময়ের কাজগুলো ব্যাখ্যা করো।

৩। প্রতিযোগিতা শেষে তোমাদের দায়িত্বগুলো আলোচনা করো।

পাঠ–০২ : দৌড় আরম্ভ ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ইভেন্ট।

শিখনফল :

১০.২.১ সঠিকভাবে দৌড় দিতে পারবে।

১০.৩.১ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

উপকরণ : চুন, জাজেস স্ট্যান্ড, ফিনিশিং টেপ, পরিমাপ ফিতা, বাঁশি।

বিষয়বস্তু : বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে অন্যান্য খেলাধুলা হোক বা না হোক, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সব প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দুই ধরনের ইভেন্ট থাকে। (ক) ট্র্যাক ইভেন্ট (খ) ফিল্ড ইভেন্ট। ট্র্যাক ইভেন্ট ও ফিল্ড ইভেন্টের মধ্যেও আবার ভাগ রয়েছে। নিচে ছকের সাহায্যে দেখানো হলো–

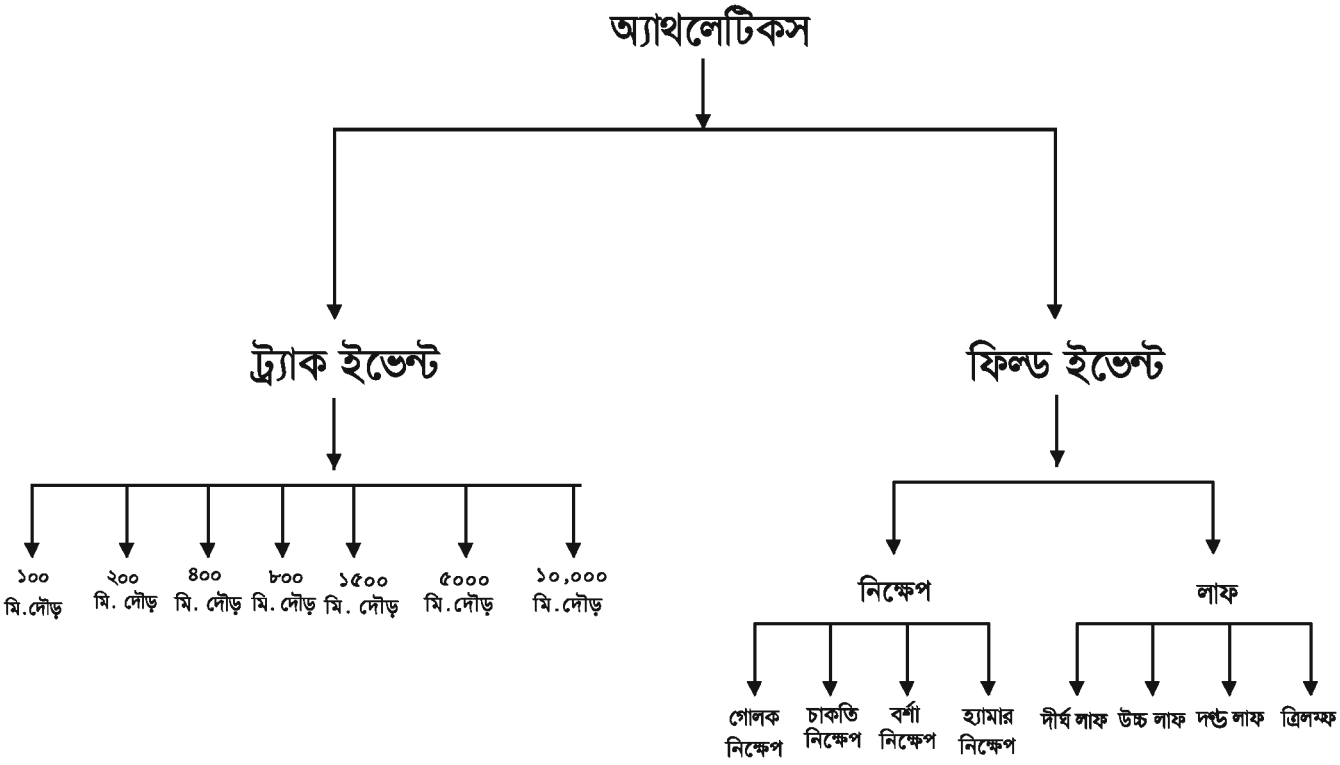

এগুলো হলো প্রতিযোগিতামূলক ইভেন্ট। এ ছাড়া আয়োজনকারী বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের বয়স, উচ্চতা, বিবেচনা করে ৫০ মিটার ও ৭৫ মিটার দৌড় এবং আনন্দপূর্ণ কিছু ইভেন্ট সংযোজন করতে পারে। যেমন– যেমন খুশি তেমন সাজো, অন্ধ দৌড়, বিস্কুট দৌড় ইত্যাদি। অতিথিবৃন্দের জন্য মিউজিক্যাল চেয়ার, বালিশ বদল ও চোখ বেঁধে হাড়ি ভাঙা এবং স্বল্প দূরত্বের দৌড়। শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা অনুসারে ৪/৫টি গ্রুপে ভাগ করে ইভেন্ট নির্বাচন করতে হবে। মেয়েদের জন্য আলাদা ইভেন্ট থাকবে। জুনিয়র গ্রুপের জন্য নিক্ষেপের কোনো ইভেন্ট থাকবে না। দৌড় ইভেন্ট বেশি থাকবে। সাথে কিছু চিত্তবিনোদনমূলক ইভেন্ট দিতে হবে। মধ্যম গ্রুপে দীর্ঘ লাফ ও উচ্চ লাফ, গোলক নিক্ষেপ এবং দৌড় থাকবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় হ্যামার, দন্ডলাফ-এগুলো সাধারণত হয় না। দৌড় ইভেন্টের মধ্যে ৫০০০মিটার ও ১০,০০০ মিটার দৌড় স্কুল প্রতিযোগিতায় থাকে না। বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীদের সুবিধা বিবেচনা করে ইভেন্ট নির্বাচন করতে হয়। সর্বাধিক শিক্ষার্থী যেন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে, সেদিকেও লক্ষ রাখতে হবে। দৌড়ের সমাপ্তি রেখায় যার বুক প্রথম টাচ করবে, সে বিজয়ী হবে।

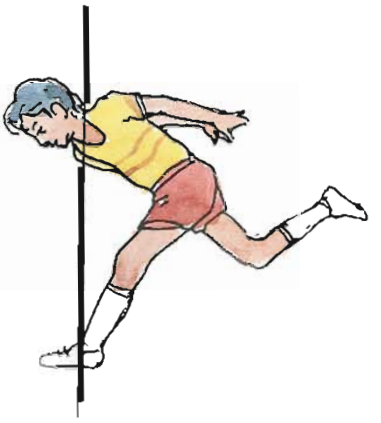

দৌড় সমাপ্তি

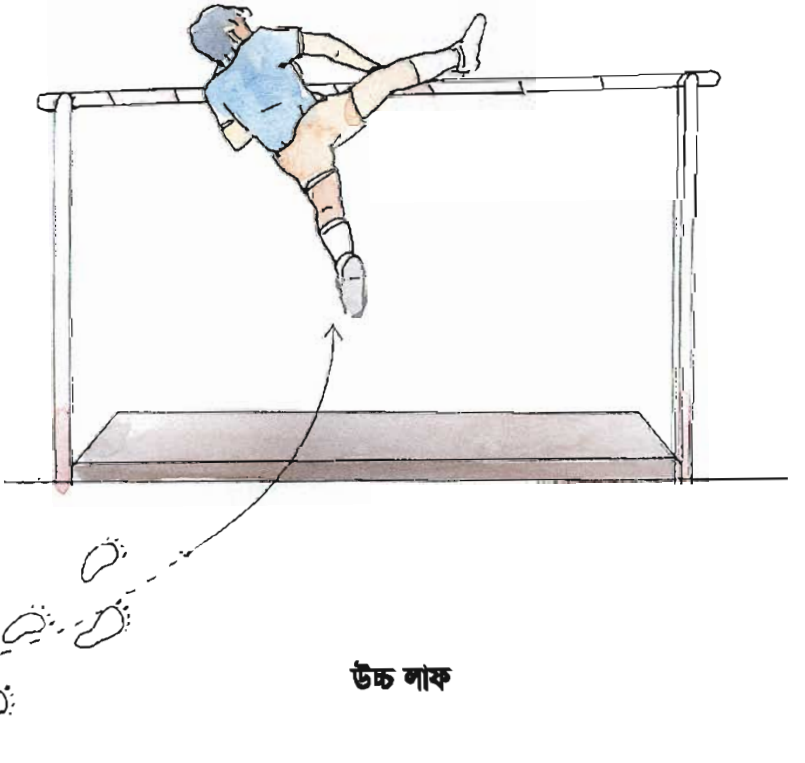

উচ্চ লাফ

শিখন শেখানো কার্যাবলি : বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ইভেন্ট কীভাবে বা কিসের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়, তা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন। ট্র্যাক ইভেন্ট ও ফিল্ড ইভেন্ট কেন বলা হয় এবং কোন কোন ইভেন্ট থাকে, তার ধারণা দেবেন। অতিথিবৃন্দের জন্য কী ধরনের ইভেন্ট থাকে এবং চিত্তবিনোদনমূলক ইভেন্ট কোনগুলো, তা বুঝিয়ে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা ট্র্যাক ইভেন্টগুলোর তালিকা প্রস্তুত করবে। তুমি কোন কোন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেছ তা বোর্ডে লিখে দেখাও। ফিল্ড ইভেন্টের একটি ছক তৈরি করবে। চিত্তবিনোদনমূলক ইভেন্টগুলোর নাম বর্ণনা করবে।

মূল্যায়ন :

১। ফিল্ড ইভেন্ট কাকে বলে? ফিল্ড ইভেন্টের অন্তর্ভুক্ত ইভেন্টগুলোর নাম লিখ।

২। ট্র্যাক ইভেন্ট বলতে কী বোঝ?

৩। চিত্তবিনোদনমূলক ইভেন্টগুলো বর্ণনা কর ।

৪। পাশাপাশি মেলাও–

ক. ২০০ মিটার দৌড়	ক. পুরুষ অতিথি
খ. গোলক নিক্ষেপ	খ. নিক্ষেপ বিভাগ
গ. দীর্ঘ লাফ	গ. সকল শিক্ষার্থী
ঘ. মিউজিক্যাল চেয়ার	ঘ. মহিলা অতিথি
ঙ. হাড়ি ভাঙ্গা	ঙ. লাফ বিভাগ
চ. যেমন খুশি তেমন সাজো	চ. ট্র্যাক ইভেন্ট

সমাপ্ত